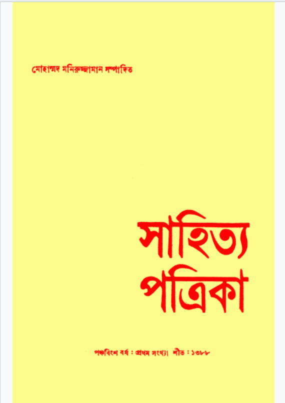

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ-চর্চা

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবদুল মান্নান সৈয়দ
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.8
Pages	140-174
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

জীবনানন্দ-চর্চা

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১.

পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় জীবনানন্দ দাশের অভ্যুদয় এই শতাব্দীর মধ্য-বিশের দশকে; ১৯১৯ শালে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়[১]; কিন্তু কবির প্রথম নিজত্ব-মাখা কবিতা 'নীলিমা' প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে' (ফাল্গুন ১৩৩২) ১৯২৫ শালে। কবির প্রথম গদ্য রচনাও প্রকাশিত হয় এ বছর।[২] সেই হিশাবে ১৯২৫ শালটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি জীবনানন্দের আত্মপ্রকাশের বছর হিশাবে। ১৯২৭ শালে কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" প্রকাশিত হয়। ঐ ১৯২৭ শালেই প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'প্রগতি';—কবির আত্মস্বাক্ষরিত দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র অনেক কবিতাই প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায়। ঐ বছরই কবি 'জীবনানন্দ দাশগুপ্ত' থেকে 'জীবনানন্দ দাশ' হন, এবং "ঝরা পালক" বইটিও এই নামেই প্রকাশিত হয়। বস্তুত ঐ 'প্রগতি' পত্রিকাতেই জীবনানন্দ-চর্চার সূত্রপাত হয়েছিলো; সূত্রপাত করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ সম্পর্কে আদি মন্তব্য আমরা অবশ্য পাই রবীন্দ্রনাথেরই; কিন্তু তাঁর প্রথম প্রকৃত সূত্রধারক বুদ্ধদেব বসু। তখন থেকে আজ পর্যন্ত—এই বছর পঞ্চাশ—জীবনানন্দ নানাভাবে আলোচিত হয়েছেন। আবার এই বছর পঞ্চাশের অর্ধেক সময় জীবনানন্দ জীবিত ছিলেন—তাঁর মৃত্যুর পরে বছর পঁচিশেক মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় এই বছর পঞ্চাশের জীবনানন্দ-চর্চার ধারাবাহিক অনতিবিস্তারিত ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

২.১.

এ তথ্য বিস্ময়কর যে, জীবনানন্দ সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৫ শালে জীবনানন্দ কিছু কবিতা পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জীবনানন্দের বয়স তখন মাত্র ষোলো। সেই কবিতাগুলি নিশ্চিত লুপ্ত হয়েছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট, যে, এই কবিতাগুলিতে একটুখানি নতুনত্ব ছিলো। তা না হ'লে কেন লিখবেন রবীন্দ্রনাথ :

> তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে। বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।

মন্তব্যটি রূঢ়, সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মন্তব্য কবির প্রথম গ্রন্থ "ঝরা পালক" সম্পর্কে।[৩] কিন্তু এই মন্তব্যটি চিরকালের মতো লুপ্ত হয়েছে। তাঁর তৃতীয় মন্তব্য ১৯৩৫ শালে। বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩৪২) জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কতিবাটি প্রকাশিত হয়েছিলো। এই পত্রিকা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যে-বিস্তারিত চিঠি লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশ এরকম : "জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।" জীবনানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে লক্ষ্যভেদী শব্দটি এই, 'চিত্র-রূপময়'। এই একটিমাত্র শব্দে জীবনানন্দের কবিতার একটি চারিত্রলক্ষণ চিহ্নিত হ'য়ে যায়। জীবনানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ ও শেষ মন্তব্য ১৯৩৭ শালে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি" সম্পর্কে :

> তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় জীবনানন্দের আর-কোনো বই বের হয়নি। প্রথমদিকে যাই হোক, শেষ-পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করেছিলেন জীবনানন্দ। এবং তখনই জীবনানন্দের একটি বৈশিষ্ট্যকে অন্তত তিনি শনাক্ত করেছিলেন যথাযথভাবে—'চিত্ররূপ-ময়' এবং 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' শব্দগুচ্ছে। এই চিত্রলতা প্রথম থেকে শেষ-অবধি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা ছিলো।

২.২.

জীবনান্দ-চর্চায় প্রথমাবধি উজ্জ্বলতম ভূমিকা পালন করেছেন বুদ্ধদেব বসু। সমগ্র-ভাবে আধুনিক কবিতা বিষয়ে, কিন্তু বিশেষভাবে জীবনানন্দ বিষয়ে, বুদ্ধদেবের ভূমি-কার কোনো তুলনা নেই। বুদ্ধদেবের রচনা থেকে একটি সাক্ষ্য :

> ...'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরাম-হীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনায় মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালায় "বনলতা সেন" প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে।
>
> ['জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', 'কবিতা', পৌষ ১৩৬১]

বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় 'প্রগতি' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে, ১৯২৭ শালে (আষাঢ় ১৩৩৪)। 'প্রগতি'-তে জীবনানন্দ নিয়মিত কবিতা লিখতেন। এই পত্রিকায় 'মাসিকী' শীর্ষে একটি সমালোচনা-অংশ থাকতো, যাতে লিখতেন বুদ্ধদেব বসু ও অন্যেরা। এতেই প্রথম জীবনানন্দ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়; আলোচক বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব প্রথম থেকেই যে নতুন সাহিত্যের প্রবল সমর্থক, গুণগ্রাহী ও বিশ্লেষক ছিলেন, 'প্রগতি' থেকেই তার সূচনা হয়েছে; জীবনানন্দ এই নতুন তরুণ সাহিত্যের একজন কর্ণধার ছিলেন—কিন্তু নিঃশব্দ; নতুন সাহিত্যের জয়গান করতে গিয়েই জীবনানন্দের চেয়ে বছর দশেকের ছোটো এই কবি জীবনানন্দকে আবিষ্কার, অনুধাবন ও প্রচার করবার প্রায় একব্রত গ্রহণ করে-ছিলেন। এর পটভূমি বোঝাতে কেবল একটি উদ্ধৃতি পেশ করবো, 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে একটুখানি অংশ :

আজকের দিনে বাঙলা দেশে যে একটি বিশিষ্ট তরুণ সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে, একথা অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। এই সাহিত্যকে নিন্দা ক'রে যাঁরা আনন্দ পান, সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁদের অধিকার আছে কিনা, অথবা তাঁদের কটূক্তির পেছনে কোনো যুক্তি আছে কিনা, সে-সব কথা এখানে তুলবো না। শুধু এই কথাটিই আমরা এখানে স্পষ্ট ক'রে জানাতে চাই যে, এই তরুণ সাহিত্যের একটা যথার্থ অস্তিত্ব আছে—তার ভঙ্গী বিভিন্ন, তার সুর নূতন, তার আদর্শ আলাদা। এই সাহিত্য হয়তো এখন পর্যন্ত একটা সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন তো পাওয়া যাচ্ছে, নির্ঝরের গতিছন্দের মত তার জয়-রথের চক্র-ঘর্ঘরে দিগন্ত মুখর হ'য়ে উঠছে; অদূর ভবিষ্যতে যে এই অস্পষ্ট, অস্ফুট ভাব-পুঞ্জের নীহারিকাই এক বিরাট, জ্যোতির্ময় নক্ষত্র প্রসব করবে, সে আশা দুরাশা নয়। তাই এই আধুনিক সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে কেবল উপস্থিত মালমশল্লাকে দাঁড়ি-পাল্লায় চাপিয়ে নিক্তির ওজনে মেপে দেখলে চলবে না, এর পেছনে যে নব-জাগরণের অনুভূতি, যে নূতন সাহিত্যিক যুগোন্মেষের আভাস রয়েছে, তা-ও গণনা করতে হবে।

['প্রগতি', আষাঢ় ১৩৩৪]

'প্রগতি'র প্রথম বর্ষের কোনো সংখ্যায় জীবনানন্দের উল্লেখ নেই; তাঁর প্রসঙ্গ ওঠে দ্বিতীয় বর্ষে। একটুখানি অংশ উদ্ধৃত করি 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে, তাতে বোঝা যাবে 'একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো':

জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত কি মোটেই Popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ; ··· তাঁর কবিতা একটু ধীর-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

['প্রগতি', আশ্বিন ১৩৩৫]

এর পর বুদ্ধদেব 'প্রগতি'র পৃষ্ঠাতেই 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ' নামে একটি নাট্যাকার প্রবন্ধ লেখেন। তার একাংশ:

জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচচারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।' ··· আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটিমাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

['প্রগতি', ভাদ্র—১৩৩৬]

'প্রগতি' বন্ধ হওয়ার পরে, কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব যখন ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, তার প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪২) থেকেই জীবনানন্দের কবিতা অজস্র-ধারে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এমনকি জীবনানন্দের মৃত্যুর পরেও তাঁর অপ্রকাশিত

অনেক কবিতা 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কবিতা' পত্রিকার শতাধিক সংখ্যার মধ্যে মাত্র অল্প যে-ক'টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তার একটি 'জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা' (পৌষ ১৩৬১, ১৯ : ২ ক্রমিক সংখ্যা ৮০)।[৫] বুদ্ধদেবের রচনা থেকেই জানি, ''ধূসর পাণ্ডুলিপি''র প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন তিনি; জীবনানন্দ কাব্যটি উৎসর্গও করেন 'বুদ্ধদেব বসুকে'। বুদ্ধদেব জীবনানন্দের একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন 'কবিতাভবন' থেকে : ''বনলতা সেন'', কবিতাভবন-এর 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থ-মালার অন্তর্ভূত। ষোলো পৃষ্ঠা, দাম চার আনা, কাগজের মলাটের ছোটো এই কবিতা-পুস্তিকাটি জনপ্রিয়ও হয়েছিলো। ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' ও ''বনলতা সেন'' এই দুটি বইএরই স্বতন্ত্র সমালোচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব। দুটি সমালোচনাই বেরিয়েছিলো 'কবিতা' পত্রিকায়। ''ধূসর পাণ্ডুলিপি''র সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'প্রকৃতির কবি' নামে; এর মধ্যাংশ থেকে একটি, এবং শেষ অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিই :

> বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' প্রকাশের পর তিনি গুণীসমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ আশা জোর ক'রেই করা যায়। ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' প'ড়ে প্রথমেই মনে হয় যে এই লেখকের আছে এমন একটি ভঙ্গি যা বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম ক্ষেত্রে), এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ করাও সহজ। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে বাচালতার বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে একথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।···
>
> এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম, কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে মনে করি, এবং ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে; আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে প্রবল ভাবেই নাড়া দেয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (আশা করি তেমন লোকের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে), তাঁরা ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।
>
> ['কবিতা' চৈত্র ১৩৪৩]

১৯৩৬ শালে বুদ্ধদেব এই মন্তব্য করেন; ১৯৪৩ শালে ''বনলতা সেন''-এর সমালোচনায় তিনি লেখেন :

> আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছরে যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না; তার চেয়ে তিনি স্বভাব-লাজুক ও মফস্বলবাসী; এইসব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে স'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে

যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে না। কেননা এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

['কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৯]৬

বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধ বিখ্যাত হয়, এবং জীবনানন্দও বিখ্যাত হন 'নির্জনতম কবি' হিশাবে। বুদ্ধদেবের এই অভিধা উত্তরকালে এতো ব্যবহৃত হ'তে থাকে যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব ১৯৫৮ শালে, "কালের পুতুল"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন:

> ···বইখানা প্রায় পূর্বের আকারেই পুনঃপ্রকাশ করা হ'লো এই ভরসায় যে পরবর্তী সমালোচকেরা, জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জনতম কবি' বলার সময়, অন্তত তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করবেন।

১৯৪৫ শালে ('কালের পুতুল'; "কালের পুতুল") বুদ্ধদেব লেখেন:

> জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে আজ সেই কথাই বলা যায়, যে-কথা এই পুস্তকে তাঁর বিষয়ে লিখতে গিয়েই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে বলেছি: তিনি আত্ম-অনুকরণের নিগড়ে আজ বন্দী।

এই একবারই বুদ্ধদেব বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন জীবনানন্দ সম্বন্ধে। জীবনানন্দ নিজেই একবার বলেছিলেন, তিনি তাঁর মধ্যজীবনে তাঁর কবিতায় সমাজ-ও-রাজনীতিকে স্থান দেওয়ায় বুদ্ধদেব মুখ ফিরিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের শিল্পবাদী মন হয়তো তাকে মেনে নিতে পারেনি, —কিন্তু জীবনানন্দও প্রবেশ করেছিলেন আবার আত্মবিবরে কিংবা তাঁর অনুভূতি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গিয়েছিলো। সে যাই হোক, বুদ্ধদেবও উপরের মন্তব্যে স্থিত থাকেননি, "কালের পুতুল"-এর দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকায় তাঁর মত বদলে গিয়েছিলো:

> এই মন্তব্যগুলি লেখা হয়েছিলো ১৯৪৫-এ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তিকালে, এবং সেই সময়ের পক্ষে এগুলি অসংগত ছিলো না। কিন্তু ইতিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর "সংবর্ত", "প্রতিধ্বনি" ও "দশমী", জীবনানন্দ দাশের সর্বশেষ ও চরিত্রবান পর্যায়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি, এবং—কোনো-কোনো কবি কবিতাকে ত্যাগ ক'রে থাকলেও—উল্লেখযোগ্য আরো দু-একটি ঘটনা ঘটেনি তাও নয়। আজ, ১৯৫৮-র অন্ত্যকালে, এ-কথা কিছুতেই বলা যাবে না যে আধুনিক বাংলা কবিতা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

১৯৫৪ শালে জীবনানন্দের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দ সংখ্যায় (পৌষ ১৩৬১) 'জীবনানন্দ দাশ' নামে একটি দীর্ঘ রচনায় (এই লেখাটিই পরে "কালের পুতুলে" 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে' নামে সন্নিবিষ্ট) স্মৃতি-চারণ ও জীবনানন্দের কাব্যবিশ্লেষণ করেছেন। ঐ সংখ্যাতেই জীবনানন্দের অন্তিম আটটি কবিতার একটি ঘনিষ্ঠ ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

১৯৬০ শালে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর পরে বুদ্ধদেব যে-রচনা লিখেছিলেন, সেখানেও সুধীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে ও বিপরীতে জীবনানন্দের কবিতাকেই তিনি স্মরণ করেছিলেন:

> জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ : এই দুটি নাম উচ্চারণ করামাত্র আধুনিক বাংলা কবিতার দুই বিপরীত প্রান্ত ঘোষিত হ'য়ে গেলো—যেন অনতিক্রম্য ব্যবধান।···তাই দু-জন, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, স্থাপত্য-ক্ষোদিত অর্ধ-দেবতার মূর্তির মতো, আমাদের সমগ্র আধুনিক কবিতাকে দুই প্রান্তে ধারণ ক'রে আছেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন ক'রে গর্বিত হ'তে পারি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ব'লে, নতুন ক'রে প্রণত হ'তে পারি ঈশ্বরের কাছে, যেহেতু মানুষের পাপক্ষালনের জন্য মানুষের মুখেই কবিতা তিনি দিয়েছেন।
>
> [বুদ্ধদেব বসু, ''সঙ্গনিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ'']

ঐ প্রবন্ধেরই শেষ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশ উদ্ধৃত করবো, যে-বুদ্ধদেব 'প্রগতি'র পৃষ্ঠায় আধুনিকতার পক্ষসমর্থন শুরু করেছিলেন একদিন যেন তার অন্তিম লেখন এটি—(অবশ্য এর পরেও বুদ্ধদেব এক যুগের বেশি বেঁচেছিলেন এবং আধুনিকতার গুণগানে ক্ষান্তি দ্যাননি) :

> আমার বয়স পঞ্চাশ পার হ'য়ে গেলো, গত ত্রিরিশ বছর ধ'রে বাংলা ভাষার কবিতার বিবর্তনে লিপ্ত আছি। স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদের গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম। আজ যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছে, যখন আজকের দিনের তরুণের দল আমার প্রিয় কবিদের আমারই কাছে প্রিয়তর ক'রে তুলছেন, তখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে অবসন্ন, আজ এতদিন পরে আমি বিশ্রাম প্রার্থনা করছি, আকাঙক্ষা করছি স্তব্ধতার অবসর, যাতে নিজের প্রতি অবশিষ্ট দু-একটা কর্তব্য অবশেষে নিঃশব্দে সম্পাদন করতে পারি।
>
> [ঐ, ঐ]

বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কবিতা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করেছেন; তাঁর আলোচনা-সমালোচনা লিখেছেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়; তাঁর গ্রন্থের প্রুফ দেখে দিয়েছেন; তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন; তাঁর কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন; তাঁর বিষয়ে 'কবিতা' পত্রিকায় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন; অন্য-একটি পত্রিকার ('উষা', পৌষ ১৩৬১) জীবনানন্দ-সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন। জীবনানন্দের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও লোকপ্রিয়তার মূলে বুদ্ধদেব বসু।

২.৩.

বুদ্ধদেব বাদে, জীবনানন্দের সমকালীন বা প্রায়-সমকালীন লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে লিপ্ত ছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেবের 'কবিতা'র মতো সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্বাশা'র দরোজাও জীবনানন্দের জন্যে ছিলো হাট-ক'রে-খোলা—'পূর্বাশা'য় জীবনানন্দের কবিতা ও প্রবন্ধ অনেক বেরিয়েছে। 'পূর্বাশা লিমিটেড' থেকে জীবনানন্দের চতুর্থ কবিতাগ্রন্থ ''মহাপৃথিবী'' প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৫১ শালে, যে-বই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকেও উৎসর্গ করেছিলেন। জীবনানন্দ বিষয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'নিরুক্ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৫০) ইংরেজি ১৯৪৩ শালে।[৮] অতঃপর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জীবনানন্দ-শ্লিষ্ট এই ক'টি রচনা প্রকাশিত হয় :

১. **'বাংলা কবিতার নতুন দিক'। 'পূর্বাশা', আশ্বিন ১৩৫৫**
২. **'লৌকিক কবি জীবনানন্দ দাশ'। 'পূর্বাশা', ফাল্গুন ১৩৬১**

৩. 'রবীন্দ্রোত্তর কোবিদ কবি'। 'কবিতা', পৌষ ১৩৬১
৪. 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা'। 'দেশ', চৈত্র ১৩৬১
৫. 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা'। 'দেশ', ২১:৫১
৬. 'শেষ লেখার দিনগুলি'। 'পূর্বাশা', ফাল্গুন ১৩৭০
৭. 'জীবনানন্দ দাশ'। 'ধ্বনি', ১৮ সংখ্যা-২৬ সংখ্যা
৮. 'পূর্বাশার কথা'। 'পূর্বাশা', শ্রাবণ ১৩৭১
৯. 'পূর্বাচলের পানে তাকাই'। 'পূর্বাশা', ফাল্গুন ১৩৭২

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর-পরই সঞ্জয় ভট্টাচার্য আবেগবিদ্ধ তিনটি এলেজি কবিতা লিখেছিলেন :

১. 'দুপুর-রাত্রিতে'। 'ময়ূখ', কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৬১
২. 'হাসপাতালে'। 'ক্রান্তি,' কার্তিক ১৩৬১
৩. 'জীবনানন্দকে'। 'পূর্বাশা', পৌষ ১৩৬১

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের তিনটি গ্রন্থে জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ উপস্থিত, শেষোক্তটি পুরোপুরি জীবনানন্দ-কেন্দ্রিক :

১. তিনজন আধুনিক কবি। পূর্বাশা লিমিটেড, ১৯৫৫
২. আধুনিক কবিতার ভূমিকা। সবিতা প্রকাশভবন, ১৯৫৯
৩. কবি জীবনানন্দ দাশ। ভারবি, ১৯৭০

'রবীন্দ্রোত্তর কোবিদ কবি' প্রবন্ধের দুটি উজ্জ্বল অংশ উদ্ধার করি :

> ···জীবনানন্দর অভিজ্ঞতা একটি অ-লৌকিক স্বতন্ত্র বস্তু। তাঁর জীবন-বোধ, প্রেমবোধ, ইতিহাস-বোধ, সমাজ-বোধ সবই স্বাতন্ত্র্যে বলয়িত এক-একটি আলোকমণ্ডল। কল্পনার আলোতে বোধগুলো উজ্জ্বলকায় হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে-কল্পনা প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার বৃত্ত ছেড়ে অলৌকিকতার পথে বিচরণশীল হয়নি। জীবনানন্দকে এজন্যেই ইতিহাসচেতন কবি বলা যায়।···
>
> জিজ্ঞাসা এ শতকের একটি প্রগাঢ় মানসিক অধিবাস (fixation)—বা মনোভঙ্গি। এ-ভঙ্গি অর্জিত হ'তে শুরু করেছে কোবিদ-চিত্তে বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে। এর যাত্রা-পথ মানবিক সভ্যতার আলোর গতিপথের মতোই অর্ধবোধ্য। ইতিহাস-গত মানুষের জীবনের মতোই তা প্রাচীন। এই প্রাচীনতার ঐতিহ্য-বাহী ছিলেন জীবনানন্দ, যার কথা মানবিক প্রেমের মতোই জীবনের অতি-গভীরে প্রোথিত। প্রেম আর প্রমাকে এক পর্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে রেখে গেছেন এ-যুগের বাঙালি কোবিদ-কবি জীবনানন্দ দাশ।

'দেশ' (চৈত্র ১৩৬১) পত্রিকায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা করেছিলেন।

তবে তাঁর সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বড়ো কাজ, জীবনানন্দের প্রায় সমকালীন একজন কবি হ'য়ে তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা। "কবি জীবনানন্দ দাশ" গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করলেও গ্রন্থটি সঞ্জয় ভট্টাচার্য দেখে যেতে পারেননি, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়েছিলো এটি। এই গ্রন্থে বারোটি পরিচ্ছেদে জীবনানন্দের কবিতার বিশ্লেষণ করেছেন— কএকটি কবিতার অনুপুঙ্খ আলোচনা আছে।

'পূর্বাশা'য় স্মরণীয়ম-কবিতাগুচ্ছের (কার্তিক ১৩৬১) তাঁর জীবনানন্দকে উৎসর্গিত একটি কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ক'রে দিই এখানে:[৯]

জী ব না ন ন্দ কে

তুমি ঘুমে কেঁদে ওঠো বলে আমি অপরাধে জাগি
কোনো অন্ধকার ভ্রূণে, নারীর অথবা পৃথিবীর।
সেখানে হয়তো অনুরাগী
সব আলো অপরার্ধে, কালোর শিবির
ক্রিমি-নীল জেনেও যেখানে।
আলোর দোকানে আলো পায় না দেখার কোনো মানে
মৃত্যুর বিমর্ষ অমাবস্যা-অপরাধ ছেড়ে এলে।

যা-যা দেখে কেঁদে ওঠো সব শিশু-চোখে অন্ধকার
অপরাধ-চিহ্নময় খানিক অঙ্গার——
নেভানো জীবন্ত গায়ালিপি——ঝলমল লেখা জ্বেলে।

সান্ত্বনার ভঙ্গী চীনাংশুক
পুরাতন রৌদ্রে মেলা বেনিশানা নতুনের নিশানের সুর।

২.৪.

জীবদ্দশায় জীবনানন্দ ছিলেন অবহেলিত, অস্বীকৃত, অজ্ঞাতপ্রায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসম্ভব মানস-প্রসারতায় জীবনানন্দ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন—কিন্তু তা এমন বিশিষ্ট ছিলো না যার দ্বারা জীবনানন্দ বিশেষভাবে চিহ্নিত হ'তে পারেন (জীবনানন্দের সম্পূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথ দেখেও যাননি)। বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের কবিপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রায় সারা জীবন কাজ ক'রে গেছেন। তরুণদের মনে তাঁর জীবনের একেবারে শেষদিকে তিনি প্রভাব ফেলতে শুরু করেন—তাঁর মৃত্যুর পরে যার বিপুল প্রকাশ ঘটে। আবার তাঁর বিরোধিতাও ছিলো (একটু পরে সে-বিষয়ে বলা হচ্ছে)। উল্লিখিতরা বাদে জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় আলোচিত হয়েছেন আধুনিক কবিতার কোনো-কোনো আলোচনায়, গ্রন্থ-সমালোচনায়। এরকম একটি আলোচনা, একেবারে প্রথম পর্বের, 'কল্লোলে' (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪) প্রকাশিত হয়েছিলো। প্র-স্বাক্ষরিত কবির প্রথম গ্রন্থের এই সমালোচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি:

ঝরা পালক——কবিতার বই, শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত[১০] প্রণীত। দাম এক টাকা।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসাহিত্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। তাঁর ছন্দ

ভাষা ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের অযথা আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়।

১৯৪০ শালে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ্ম-সম্পাদনায় "আধুনিক বাংলা কবিতা" নামে একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয় কবিতাভবন থেকে; প্রকাশক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এতে জীবনানন্দের বেশকয়েকটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। ১৯৫৪ শালের মার্চ মাসে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় "আধুনিক বাংলা কবিতা" পুনঃপ্রকাশিত হয় ঐ কবিতাভবন থেকেই। তাতেও স্বাভাবিকভাবে জীবনানন্দের কবিতা ছিলো—এবং ভূমিকাতেও উল্লেখ ছিলো তাঁর। মার্চ মাসে "আধুনিক বাংলা কবিতা" প্রকাশিত হয়, অক্টোবরেই জীবনানন্দ লোকান্তরিত হন। ফলে এই সংকলন নিয়ে বেশ-কিছু আলোচনা-সমালোচনা হ'লেও তা ঠিক তাঁর জীবদ্দশায় বলা চলে না। ("শ্রেষ্ঠ কবিতা"র ক্ষেত্রেও এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে জীবনানন্দের: মে মাসে প্রকাশিত হয় এ বই, অক্টোবরে তিনি মারা যান। বুদ্ধদেবের "আধুনিক বাংলা কবিতা" এবং তাঁর নিজস্ব "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ যখন বৃহত্তর পাঠকের কাছে পেঁ ৗছোবেন, তখনই তাঁর বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠলো।)

তাঁর জীবদ্দশায় জীবনানন্দ আলোচিত-সমালোচিত হয়েছেন আরো যে-সব রচনায় তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' ('প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা', ১৯৪২), নিখিলকুমার নন্দীর 'এ শতকের বাংলা কবিতা' ('প্রবাসী', ষষ্ঠবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৩৫০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'নির্জনতম কবি' ('বনলতা সেন"-এর আলোচনা। 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৬০), অরুণকুমার সরকার-এর 'বাংলা কবিতার বহিরঙ্গ ('গাঙ্গেয়', ভাদ্র ১৩৬০) প্রভৃতি।

৩.১.

দীর্ঘ দিন উপেক্ষিত ও অবহেলিত ছিলেন জীবনানন্দ; পরে আবার আক্রমণের লক্ষ্যও হ'য়ে ওঠেন। জীবনানন্দের দুর্ভাগ্য (এবং আরো বেশি দুর্ভাগ্য আমাদের), যে, তথাকথিত রক্ষণশীল ও তথাকথিত প্রগতিশীল দুই দলই ছিলো তাঁর বিরোধী, এবং তাঁর বিরুদ্ধে দুই তরফের দুটি পত্রিকা ('শনিবারের চিঠি' ও 'পরিচয়') বলতে গেলে কোমর বেঁধেই লেগেছিলো।

এম্নিতে জীবনানন্দের ব্যক্তিজীবনেও ছিলো বিপুল অশান্তি। অর্থকষ্ট, চাকরি-জীবনের দুর্ভাগ্য তাঁকে সারা জীবনই সইতে হয়েছে। অধ্যাপনা করেছেন বিভিন্ন প্রাইভেট কলেজে—কোনো-কোনো কলেজ থেকে চাকরি চ'লে গেছে। সিটি কলেজের চাকরি চ'লে যাবার পিছনে ছিলো কলেজের অর্থনৈতিক অসুবিধা কিংবা যা অধিক-প্রচারিত সেই ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রভাবিত কলেজ-কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তাঁর কোনো-কোনো কবিতা সুরুচি লংঘন করেছে ব'লে। কোনো-কোনো কলেজ-কর্তৃপক্ষের অভিযোগ ছিলো তিনি ঠিকমতো পড়াতে পারতেন না। শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতাও বিঘ্ন ঘটাচ্ছিলো। মূলে ছিলো তাঁর অসামাজিকতা, বিষণ্ণতা, মানুষের সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ ঘটাতে পারতেন না। স্বপ্নমগ্ন এই কবিকে কিছুদিন বীমার দালালিও করতে হয়েছিলো। এছাড়া ছিলো পারিবারিক অশান্তি: বাড়িতে সাব্‌লেট্ বসিয়ে কিছুতেই উচ্ছেদ করতে পারছিলেন না ভাড়াটে এক মেয়েকে। এরকম একটি রটনাও আছে তাঁর আত্মীয়স্বজন একবার তাকে চেপে ধরেছিলেন বনলতা সেন কে জানবার জন্যে এবং তাঁর মতো

বিবাহিত একজন পুরুষ অপর নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত কেন এর জবাব দাবি করেছিলেন। সর্বোপরি ছিলো তাঁর অতিব্যক্তিগত কবিতার দুরূহতা, দুর্বোধ্যতা, উন্মাদনার বদনাম। এর মধ্যে ছিলো দুই বিরোধী আদর্শের অবিরল আক্রমণ।

৩.২.

'শনিবারের চিঠি' আজন্ম ছিলো আধুনিক সাহিত্যের বিরোধী। সম্পাদক সজনীকান্ত দাস আধুনিক সাহিত্যের বিরোধিতাকে ব্রত হিশাবে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠির ঈষদংশ উদ্ধৃত করলেই তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হবে: ২৩ শে ফাল্গুন ১৩৩৩ শালে লেখা এই চিঠি:

> সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরনের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা Stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাঁধ-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature এর দোহাই পাড়েন।

এই পত্রে জীবনানন্দের উল্লেখ অবশ্য ছিলো না, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সজনীকান্তের মারমুখী মনোভাব এতে স্পষ্ট। 'শনিবারের চিঠি' এগ্নিতেই কল্লোল-কালি-কলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো;—জীবনানন্দ এ দুই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো জীবনানন্দের কবিতা, এমনকি ব্যক্তি জীবনানন্দ। পত্রিকাটি জীবনানন্দকে নানা অনুচ্চার্য গালাগাল তো দিয়েছিলোই, এমনকি জীবনানন্দ প্রসঙ্গ উঠলেই ব্র্যাকেটে লেখা থাকতো 'জীবনান্দ নহে' বা 'জিহ্বানন্দ নহে'। এই পত্রিকায় জীবনানন্দের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন নারায়ণ চৌধুরী, সজনীকান্ত দাস এবং অন্যেরা—যাদের কেউ-কেউ নিজেরাই ছিলেন কবিযশোপ্রার্থী।

'কবিতা' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৪ (৩ : ১) সংখ্যায় জীবনানন্দের 'ও হৈমন্তিকা।'[১১] ও 'ফিরে এস'[১২] নামে দুটি কবিতা বেরোয়। এই কবিতাদ্বয় সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ সংখ্যায় লেখা হয়:

> কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না; রসের যে তুরীয়-লোকে তিনি উত্তরোত্তর উত্তীর্ণ হইতেছেন বুদ্ধদেব বসু অথবা সমর সেনের প্রশংসা সেখানে আর পৌঁছিবে না। জলসিঁড়ি নদীর ধারে যেখানে ধানসিঁড়ি ক্ষেত তাহারই পাশে জাম হিজলের বনে তাঁহার মন এতকাল পড়িয়া ছিল। নাটোরের বনলতা সেন সেখান হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া কাঁচাগোল্লা খাওয়াইয়া অনেকটা দুরন্ত করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু জাল ছিঁড়িয়া তিনি আবার ভাসিয়াছেন—চিতা বাঘিনীর ঘ্রাণে ব্যাকুল ঘাই-হরিণের মত। আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

*

এবার হৈমন্তিকী। হৈমন্তিকীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মত তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
হে হৈমন্তিকী,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস!

প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে লইতাম—ভালবাসিতাম। এইবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। এক সঙ্গে দেহের আহার ও মনের ওষুধ—এ সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

*

কিন্তু হৃদয় কি অকারণেই ঘাস হইয়াছে ?

একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব।

প্রেয়সী নীল ডিম বুনিয়াছেন, ঘাসের মাঝখানে শিশিরে পড়িয়া তারা নীরব আছে। কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন—

পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !

কবিতা পত্রিকার সুদিন আসিতেছে মনে হইতেছে।

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৪৫ শালে জীবনানন্দের 'ফুটপাথে'[১৩] কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক ১৩৪৫ সংখ্যায় লেখা হয় :

কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) 'চতুরঙ্গ' (চৌরঙ্গীর ?) 'ফুটপাথে' বসিয়া পড়িয়াছেন :

অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।

কলিকাতার ফুটপাথে আমরাও চলাফেরা করি এবং অনেক গভীর রাতে যে না করি হলফ করিয়া তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ফুটপাথে সর্পিণী সহোদরার মতো বিষাক্ত ট্রামের লাইন দেখা কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। আমাদের বরাবরই সন্দেহ ছিল, হোটেলগুলি পুরা দাম লইয়া আমাদিগকে ঠকায়, এইবার তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। জীবনানন্দবাবুর (জীবানন্দ নয়) বরাত ভাল, খাঁটি জায়গার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। লক্ষণ সব ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, কবি 'নির্জলা' সত্য বলিতেছেন—

পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।···
সবুজ ঘাসের ভেতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে।

শেষ পরিণতিতে আমরা সরিষা ফুল দেখিয়া থাকি, দেয়ালি পোকা সম্পূর্ণ অভিনব। জীবনানন্দের (জীবানন্দ নয়) অরিজিনালিটি আর অস্বীকার করা চলিবে না।

'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৪৫ (৪:২) সংখ্যায় জীবনানন্দের 'তার স্থির প্রেমিকের নিকট—কোনো উদ্দীপিতা'[১৪] কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে 'শনিবারের চিঠি'র মাঘ ১৩৪৫ সংখ্যায় লেখা হয়:

ধবল কুষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ (জিহ্বানন্দ নহে) সম্প্রতি 'ধবল শব্দ' শুনিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বিশেষ সংকোচের সহিত বলিলেন, ফেরঙ্গ-রোগ পর্যায়ে এ একটা কঠিন ব্যাধি। 'রক্ত-গোধিকার লালের' সহিত 'কৃষ্ণ কর্ণমর্দনের' নিয়মিত প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই ব্যাধি সারিবার নহে। ব্যাধি নিশ্চয়, নহিলে এরূপ প্রলাপ কেন?

মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে;
মনীষার বইগুলো আরো স্থির,—শান্ত,—আরাধনাশীল;
পৃথিবীতে চরি সমস্বরে—রক্তগোধিকার মত লাল:
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি বিকোষিত জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেণ্ট-পাল
বুঝিবে আমার কথা; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মত অনন্ত ব্যাদানে।

ভাইপো ন্যাপলা পাশে দাঁড়াইয়া কবিতাটি শুনিতেছিল, হঠাৎ 'হয়েছে' 'হয়েছে' বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—কি হয়েছে?—আমার বিরক্তি ন্যাপলা টের পাইয়াছিল। মাথা চুলকাইয়া বলিল—ধূসর।

তাহার হাতে শব্দ-প্রতিযোগিতার একটা কাগজ, বুঝিলাম 'ধূসরে' আটকাইয়া ছিল।

'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দের 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'[১৫] কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে 'শনিবারের চিঠি'র চৈত্র ১৩৪৫ সংখ্যায় লেখা হয়:

'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' দেখিয়াছেন? চৈত্রের 'পরিচয়ে' দেখিতে পাইবেন। নাটোরের বনলতা সেনকে বিস্মৃত হইয়া কবি জীবনানন্দের (জিহ্বানন্দ নহে) এই টারানটেলা নাচ! হায়রে যদি নাচ না হইয়া সোয়ান সঙ হইত!

পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা···
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।···
সেইখানে যূথচারী কয়েকটা নারী···।
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই;

গোপালদা এবার আর্তকণ্ঠ। বলিলেন, থাম। তিনি ই. বি. আর. ও বি. এন. আর. —এর টাইম-টেবল ঘাঁটিতে লাগিলেন। বরিশাল হইতে রাঁচি। খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দেখছি, দুর্ভোগ বড় কম হবে না।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জবানিতে আমরা জানতে পারি জীবনানন্দের ট্রাম-দুর্ঘটনার পরে 'সাহিত্যিক বিরোধিতা'—সত্ত্বেও সজনীকান্ত জীবনানন্দের শেষকৃত্য পর্যন্ত ... আন্তরিক সহযোগিতা দেখিয়েছেন। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক ১৩৬১ সংখ্যায় দীর্ঘ সাহিত্যিক বিরোধিতার যতি টানেন জীবনানন্দকে কবি-স্বীকৃতি দিয়েই :

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন, তিনি অকপটে সুদৃঢ়তম নিষ্ঠার সহিত কাব্যসরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গিতে অস্পষ্টতা থাকিলেও সাধনায় কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না। তিনি ভঙ্গি ও ভান সর্বস্ব কবি ছিলেন না। তাঁহার অবচেতন মনে কবিতার যে প্রবাহ অহরহ বহিয়া চলিত, লেখনীমুখে সজ্ঞান-সমতলে তাহার ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ দিতে প্রয়াস করিতেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তব্যের চাবিকাঠি খুঁজিয়া পাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন, যাঁহারা তাহা পাইতেন না তাঁহারাই বিমুখ হইতেন। ...এই হিংসা-হানাহানি-কলহ-বিদ্বেষ-কণ্টকিত বর্তমান পৃথিবীতে এই উদারহৃদয় প্রসন্ন প্রেমিক কবিকে পদে পদে আমাদের মনে পড়িবে।

৩.৩.

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দের কএকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো। 'পরিচয়' পত্রিকা সমাজতান্ত্রিক কবিদের হাতে আশার পরেও তিনি তাতে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তখন জীবনানন্দ সমাজতান্ত্রিক কবি-লেখক অনেকের দ্বারা সমালোচিত। তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এই সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার প্রধান ধারক ছিলো 'পরিচয়', 'বারোমাস', 'নতুন সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকা, এবং লেখক-কবিদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'নির্জনতম কবি' শীর্ষে ''বনলতা সেন''-এর একটি আলোচনা লিখেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৬০ সংখ্যায়।

ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, গোঁয়ার ও ঈর্ষাতুর আলোচনা লিখেছিলেন মণীন্দ্র রায়। বেরিয়েছিলো 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৬২ সংখ্যায়, শিরোনাম 'কবি জীবনানন্দ দাশ'। জীবনানন্দের আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর পরে সর্বত্র যে-উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছিলো, যেন তার দ্বারা আহত হ'য়েই মণীন্দ্র রায় সমালোচনাটি লিখেছিলেন। প্রথম অনুচ্ছেদটি এই :

একদিক দিয়ে জীবিত কবির কাব্যালোচনার চেয়ে পরলোকগত কবির কাব্যবিচার অনেক সহজ। কারণ যিনি বেঁচে আছেন এবং লিখে চলেছেন তাঁর বিষয়ে আমরা নিরাসক্ত হতে পারিনে—শেষ কথাও বলতে পারিনে। কিন্তু মৃত কবির কাব্য-বিচারেও অসুবিধা ঘটে। বেঁচে নেই বলে তিনি কিছুটা সদয় ব্যবহার তো পানই, উপরন্তু স্মৃতি পূজার হিড়িকে তাঁর বিষয়ে চারদিক থেকে সত্য মিথ্যা এত প্রশস্তি-পত্র রচিত হতে থাকে, যার ভেতর থেকে কবির আসল চেহারা আবিষ্কার করা অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই পণ্ডশ্রম হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ তাঁর ''শ্রেষ্ঠ কবিতা''র ভূমিকায় লিখেছিলেন, ''কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার।'' এই 'ব্যক্তিমন' শব্দটিতে মণীন্দ্র কদর্থক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এবং একের পর এক খারিজ ক'রে দিয়েছিলেন জীবনানন্দের এক-একটি গ্রন্থকে :

১. জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''ঝরা পালক'' কেবল নামে নয়, বক্তব্যেও তাঁর সমবয়সী কবির ''অগ্নি-বীণা''-র চেয়ে অনেক নিরীহ, নিরুত্তাপ এবং নিরুৎসাহ-জনক। রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, এ কাব্যে মোহিতলাল-যতীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিদের প্রভাব আবিষ্কারও কঠিন নয়। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের ''প্রথমা'' নতুন বক্তব্যকে কাব্যরূপায়িত করে সে-সময়ে বিশিষ্টতা লাভ করেছিল, কিন্তু ''ঝরা পালক'' সমাদর পায়নি। কবির কাব্যরচনার ব্যর্থতাই যে তদানীন্তন পাঠকের ঐ আপেক্ষিক উদাসীনতার একমাত্র কারণ তা বোধ হয় না।

২. ···প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের নমুনা পাতায় ছড়ানো থাকা সত্ত্বেও ''ধূসর পাণ্ডুলিপি'' রবীন্দ্রোত্তর কাব্যজগতে প্রথম শ্রেণীর কবির আগমন সূচিত করেনি। প্রবল কবিত্বশক্তি এবং তাকে কোনো মূল বিশ্বাসে সংগ্রথিত করার অক্ষমতা জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ''বনলতা সেন'' এবং তারপরেও ''মহাপৃথিবী'' পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

৩. ''ঝরা পালক'' থেকে শুরু করে একেবারে কবিজীবনের শেষ অবধি এই প্রেমই ছিল ধ্রুব নক্ষত্র। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিতান্ত 'মুড' নির্ভর হওয়ায় এই প্রেমের অভিব্যক্তি ফিকে হয়ে গেছে; শুধু 'বনলতা সেন' বা 'নগ্ন নির্জন হাত' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় কল্পনার সৌকর্যে বক্তব্যহীনতা চাপা পড়েছে মাত্র।

মণীন্দ্র রায়ের বিবেচনায় ''সাতটি তারার তিমির'' জীবনানন্দের 'উজ্জ্বলতম রচনা' তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত :

> ···যদি তিনি নিজের ভাবনাচিন্তাকে আরো সচেতনভাবে সংগঠিত করতে পারতেন এবং তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকত, জীবনানন্দ দাশ হয়তো রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন মহৎ কবি হতেন। তার অভাবে তিনি হয়ে আছেন শুধু ক্ষমতাবান কবি—এক মহৎ সম্ভাবনার খণ্ডিত সিদ্ধি।

মণীন্দ্র রায়ের এই দীর্ঘ আক্রমণাত্মক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, 'পরিচয়'-এর মাঘ ১৩৬২ সংখ্যায়; এ সংখ্যাতেই মণীন্দ্র রায় তার জবাবও দেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ একটি আলোচনা লিখেছিলেন 'বারো মাস' পত্রিকায়, নাম 'কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনদর্শন'। লেখাটিতে জীবনানন্দের প্রশংসা ছিলো, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলো জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতা, আশাহীনতা ও অমানবিকতার বদনাম। খানিকটা উদ্ধৃত করছি :

> আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন কবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জীবনানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। শুধু অন্যতম বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আঙ্গিক ও জীবন-দর্শনের জটিলতার জন্য জীবনানন্দের কাব্যধারা ছিল সুস্থতম আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের বিরোধী। তথাপি

তাঁর কিছু কিছু কবিতা কাব্যরসপিপাসু মনকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির অতীতস্তরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক রহস্যময়তার মায়াজাল সৃষ্টিতে জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এই মারাত্মক দুর্বোধ্যতার প্রভাব সমসাময়িক বহু তরুণ কবির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের থেকে আমদানি এই দুর্বোধ্যতা ও প্রজ্ঞাসবস্বতার প্রভাব বাংলাদেশে জীবনানন্দের মতো বহু শক্তিশালী কবিই অতিক্রম করতে পারেননি।

এই নির্জনতাপ্রিয়, নির্বিরোধী ও স্বল্পবাক কবি বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেও তাঁর কাব্যের মূল সুরটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন-ঝংকারে ঝংকৃত ক'রে তুলতে পারেননি। অথচ কী অসামান্য শক্তি নিয়েই না তিনি জন্মেছিলেন! সংবেদনশীল মনের রঙ দিয়ে সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে যেখানেই তিনি পল্লী-প্রকৃতি ও কৃষক জীবনের বেদনামিশ্রিত কৃষিভূমির ছবি আঁকতে গেছেন, সেখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। দুঃখের বিষয় সেই একই কবিতার গতি ও পরিণতির মধ্যে যেখানেই তিনি তাঁর অসুস্থ মানসিকতার অনর্গল উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের কাছে চির দুর্বোধ্য জীবনদর্শনের অবতারণা করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের আতঙ্কিত করেছেন। এই অদ্ভুত মানসদ্বন্দ্ব তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই প্রতিফলিত। জীবনানন্দের জীবনদর্শন একাকীত্বের তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্য অন্তর্মুখীন। যে অন্তরের, দ্বার, গবাক্ষ, জানালা, বাতায়ন মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যুদ্ভূত অহংকারে অবরুদ্ধ।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' প্রকাশিত হয় 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায়। জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ : জীবনানন্দের পুনরাবৃত্তি প্রবণতা ও বিবর্তনহীনতা ('জীবনানন্দ বারবার আমাদের মুগ্ধ করেছেন কিন্তু কোনো মৌলিক পরিবর্তন তাঁর কি বক্তব্যে কি ছন্দে আসেনি।') ; অতিব্যক্তিকতা তথা অ-নৈর্ব্যক্তিকতা ('বিহারীলালের মতোই জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিমানসের সঙ্গে এই জীবনের পারিপার্শ্বিক জগতের একটি অসেতুসম্ভব পার্থক্য চিরকালই অনুভব করেছেন—তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্তিগত সুরে বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। অথচ পূর্বেই আমরা দেখেছি সব বোড়া শিল্পীর আবেগই নৈর্ব্যক্তিক।') ; পারম্পর্যহীনতা (উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন "সাতটি তারার তিমির"-ভুক্ত 'রাত্রি' কবিতাটি) ; দীর্ঘ কবিতার অসাফল্য (উল্লেখ করেছেন "মহাপৃথিবী"-ভুক্ত "আট বছর আগের একদিন" কবিতাটি)—ইত্যাদি।

জীবনানন্দের সমাজতান্ত্রিক সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে যুক্তি ও যথার্থ-গভীর আলোচনা করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধ 'সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ' প্রথমে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ; পরে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ "কবিতা কল্পনালতা"-য় স্থানপ্রাপ্ত। জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ভালো-মন্দে মিশ্রিত :

তথাপি এই কবিতাতেই ['মাঘ-সংক্রান্তির রাতে'] আমরা উপলব্ধি করি যে জীবনানন্দ তাঁর আবেগময় বিশ্বাসের সব ফাঁকটুকু মননের সাহায্যেও ভরাট করতে পারছেন না। যেই তিনি কর্মনিষ্ঠ মানবতার সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্ররূপা। নারী প্রেমের মিলিত আশ্বাসকে খুঁজতে যান, তখনই তাঁকে বর্তমানের প্রসঙ্গকে অপরিহার্য বলে মেনে নিতে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সেই সুদূর অতীতের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ভাষার ভূমিকা পঙ্গু হয়ে পড়ে। তখনই তাঁর ভাষায় শৈল্পিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে আমরা ব্যথিত হই। জীবনানন্দের বাগ্‌ভঙ্গিতে যে ত্রুটি ক্ষীণভাবে বরাবর বিদ্যমান তা অসতর্কতার প্রশ্রয় পেয়ে এবারে প্রকট হয়ে উঠল। দীর্ঘায়িত বাক্য কথ্যছন্দ,

ভাবছন্দের সীমা ছাড়াল। 'প্রয়াণ পটভূমি' কবিতার নবম পঙ্‌ক্তি থেকে সপ্তদশ পঙ্‌ক্তি এর একটি সাধারণ প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা চলে। জীবনের যে বিস্তৃতির দিকটি কবি কোনো দিন দেখেননি—মানুষের ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গিয়ে সেই বিস্তৃত জীবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে তাঁর দরকার ছিল নতুন করে টেকনিকের রহস্যমোচন। দুর্ঘটনা তাঁকে সেই সময় দেয়নি।

জীবনান্দ তাঁর সাফল্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিখিয়েছেন: ভালবাসা। আর তাঁর ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে শিল্পীকে শিখিয়েছেন থীম্‌ অথবা আঙ্গিক এককভাবে এর কোনোটাই যেন শিল্পীর কাছে চরম বা absolute না হয়।

৪.১.

১৯৫৪ শালে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুকালে কবির বয়স ৫৫,[১৬] গ্রন্থসংখ্যা সাত,[১৭] তাঁর জীবিকাজীবনের অস্থিরতার মধ্যে হাওড়া গার্লস কলেজে অপেক্ষাকৃত সংহত ও স্থির,[১৮] তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্ধমান, এবং কবি ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছেন। যে-উপেক্ষা ও অবহেলায় কবির সারা জীবন কেটেছে, এখন তা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিলো; অন্ত-র্জীবনেও হয়তো একটু শমশান্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি;—তখনই মৃত্যু এসে পর্দা টেনে দিলো।

মৃত্যুকালে জীবনানন্দ যে গুরুত্বপূর্ণ কবি হিশাবে বিবেচিত হচ্ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তৎকালীন বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং অন্যান্য সাহিত্যপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ সশ্রদ্ধভাবে উল্লিখিত হয়। ৬ই কার্তিক ১৩৬১, ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ শালে জীবনানন্দের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। শিরোনাম ছিলো: পরলোকে কবি জীবনানন্দ দাশ। /শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে জীবনাবসান।' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র ৮ কার্তিক ১৩৬১, ২৫ অক্টোবর ১৯৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই সংবাদ:

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ
শনিবার কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

(স্টাফ রিপোর্টার প্রদত্ত)

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীজীবনানন্দ দাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাঁহার অগণিত অনুরাগী সাহিত্যিক ও বন্ধুদের উপস্থিতিতে শনিবার কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাটে সম্পন্ন হয়।

গত ১৪ই অক্টোবর রাসবিহারী এভিনিউতে ট্রাম দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর হইতে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার অবিরাম সংগ্রাম চলিতে থাকে। অবশেষে শুক্রবার মধ্যরাত্রি নাগাদ বাংলার এই যশস্বী কবি চিরনিদ্রায় অভিভূত হন।

শনিবার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা অর্পণের জন্য তাঁহার অনুরাগী বন্ধুবান্ধব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষানুরাগী এবং কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বাসভবনে সমবেত হন। শোকযাত্রা সহকারে মৃতদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে

লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে এবং শ্মশানঘাটে বহু ব্যক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শবাধারে মাল্যদান করা হয়। বহু কবি ও সাহিত্যিক শবযাত্রায় অনুগমন করেন।

যাঁহারা শবযাত্রার অনুগমন করেন, কবির বাসভবনে অথবা শ্মশানঘাটে যান তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, ডাঃ সরোজ দাস, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীনারায়ণ গাঙ্গুলি, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীমতী প্রতিভা বসু, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণকুমার সরকার, শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ গুহ, শ্রীভূমেন গুহ, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীঅমল দত্ত, অধ্যাপক অজিত বসু, শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

··· তিনি লাজুক স্বভাব ও স্বল্পভাষী হওয়ায় কোন সভাসমিতি লোকসমাবেশে তাঁহাকে কখনো সপ্রতিভ মনে হয় নাই, কিন্তু অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার কাব্যালোচনা এবং পরিহাসপ্রিয় কথনভঙ্গী বিশেষভাবে আদৃত ছিল। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে তাঁহার লেখনভঙ্গী যেমন স্বতন্ত্র তেমনি তাঁহার জীবনও সমস্ত দলাদলি, ঈর্ষা ও গোষ্ঠীকাতরতা হইতে দূরে ছিল। তাঁহার আর-একটি লক্ষণীয় সদ্‌গুণ ছিল, সমসাময়িক কবিদের তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সমঝদার ও সহানুভূতিশীল পাঠক ছিলেন। প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র নিবিড় আত্মীয়; খাল-নদী-জঙ্গলে তিনি নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ভালোবাসিতেন এবং কলিকাতায়ও মধ্যরাত্রির নির্জনতায় তাঁহাকে পথে পথে ঘুরিতে দেখা যাইত। এই নির্জনতা ও প্রকৃতির আলোক [ক্য] তাঁহার কবিতায় প্রতিভাত।

তাঁহার আত্মরটনার অভ্যাস ছিল না এবং নিজের জীবন সম্পর্কে কোনো আলোচনা বা স্মৃতি লেখায় তিনি আরও বেশী কুণ্ঠিত ছিলেন। ফলে যদিও তিনি তখনকার একজন অগ্রগণ্য কবি, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তবু তাঁহার জীবনী সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক মহলও অত্যন্ত স্বল্পজ্ঞাত।

৮ কার্তিক ১৩৬১-র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ঐ সংখ্যাতেই 'কবি জীবনানন্দ দাশ' শীর্ষে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। তার শুরু ও শেষ এরকম:

কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্যপাঠক প্রত্যেকেই এই কারণে বিশেষ বেদনা অনুভব করিবেন যে, আকস্মিক এই দুর্ঘটনার আঘাত রবীন্দ্রোত্তর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকে চিরকালের মত নীরব করিয়া দিল। ···

কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনদিগকে সান্তনা নিবেদন করিতেছি।

সাধারণ পাঠকমহলে, বিশেষত লেখকদের মধ্যে তাঁর লোকপ্রিয়তার প্রমাণ তাঁর মৃত্যুর পরে-পরেই সাতটি পত্রিকার বিশেষ জীবনানন্দ-সংখ্যার প্রকাশ: 'কবিতা', 'ময়ূখ',

'ঊষা', 'জলার্ক', 'গার্লস কলেজ পত্রিকা', ও 'একক'। (পরে এই পত্রিকাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।) বিশেষ জীবনানন্দ-সংখ্যা প্রকাশের আগে 'ময়ূখ' পত্রিকার সাধারণ একটি সংখ্যাও, কার্তিক-অগ্রহায়ণ (হেমন্ত) ১৩৬১ সংখ্যা কবিকেন্দ্রী কয়েকটি রচনা প্রকাশ করে। এতে জীবনানন্দের 'উত্তররৈবিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের বার্ষিক সংখ্যা থেকে ; কবির যৌবনের একটি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হয় ; সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'দুপুর রাত্রিতে' নামে একটি এলেজি-কবিতা ; ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ বেদনার্ত একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয়। ঐ সম্পাদকীয়ের অংশ :

> ...আমাদের কালে খুব কাছাকাছি থেকে প্রথম যে ভয়াবহ মৃত্যুর রূপ দেখে আমরা ভীত হয়েছি, তা জীবনানন্দের। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে হয়তো একটু সহনশীল করুণ আভিজাত্য ছিলো ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে বিমূঢ় করে দেওয়ার মতো প্রথম যে-মৃত্যু, তা কি নিষ্ঠুরভাবে দীন! তা-ই আরো মর্মান্তিক দুঃখের! হয়তো দুর্ভাগ্যই যে, আমরা তাঁর মৃত্যুর হাতে দীন সমর্পণের শেষ দিনগুলিতে তাঁকে অত্যন্ত নিকট-সান্নিধ্যে দেখেছিলাম ; আর দেখেছিলাম বলেই যেহেতু রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার সমারোহময় যে-ছবি আমরা কল্পনা করতে পারি, তার অতি সামান্য অংশের সঙ্গেও এই হতমান দিন ক'টির রঙের সমতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তাই কিছুটা অনুযোগ যেমন আমাদের নিজেদের ওপর—যারা তাঁর অনুরক্ত বলে পরিচিত হতে ভালোবাসি তেমনি বেশ কিছু অভিযোগ—যাতে ক্রোধের মিশেলও বুঝি থেকে যাবে—তাঁদের অনেকের প্রতি, যাঁরা তাঁর প্রকৃত রসগ্রাহী ও ঐকান্তিক বন্ধু-সুহৃদ বলে তাঁর পরিশ্রমের মূল্যগত লাভালাভের সঙ্গে প্রত্যক্ষত জড়িত। কিন্তু তার কথা বলার উপযুক্ত স্থান এই নিবন্ধ নয়।
>
> হয়তো সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বা স্বাভাবিক বলেই সাধারণ যে, আমাদের পূর্বসূরীদের রবীন্দ্রলোক থেকে বহির্গত হবার জন্যে বেশ সাধনা করতে হয়েছিলো...

...সেই পুরোনো কারণেই বুঝি-বা আবার ঘুরে-ফিরে সেই প্রভাবপ্রিয় আধিপত্যে ফিরে আসতে হয়। তাছাড়া উপায় থাকে না ; নইলে জীবনানন্দকেই বা এতো ভয় কেন আজ আমাদের! আশ্চর্যের কথা, পূর্বাচার্যগণ রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে এতোই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোভনীয় একেকটি পথ গড়ে তুললেন যে, প্রবল বাধ্যবাধকতা না থাকলেও অনেকের সে-পথে না-হেঁটে কিছু দিন অন্তত উপায় থাকবে না। জীবনানন্দের মোহময় বৈশিষ্ট্য ও আধিপত্যপ্রবণতা যেহেতু সবচেয়ে সোচ্চার তাই তাঁর জীবিতকালেই প্রায় প্রত্যেককে তাঁর পথের ধুলো ভেঙে কাব্যের খোলা আসরে আসতে হয়েছে ; আবার একবার আমাদের নিজেদের কালে আরেক প্রবল আকর্ষণে নিক্ষিপ্ত হয়েছি আমরা। আর এ থেকে মুক্ত হবার সাধ্য-সাধনার দায় সম্পূর্ণত আমাদের। তাঁর জীবিতকালে যদি-বা তাঁর থেকে দূরে যাওয়া সহজতর হতো, আজ তাঁর তিরোধানের পরে, আমাদের ভয় হয়, কাজটা বোধ করি ততোটা সহজ হবে না। কেননা, যদি ভেবে দেখি, তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর পরোক্ষ সাহায্য আমরা তাঁর থেকে ছিন্ন হওয়ার কাজে পেতে পারতাম ; কিন্তু তাঁর অবর্তমানে শূন্যতাটা অপরদিকে এতো গভীর হয়ে দেখা দেবে যে, তার আকর্ষণ থেকে পরিত্রাণ বুঝি সোজা নয়। রবীন্দ্রনাথের পরে, এই একই, যদিও প্রবলতর, ঘূর্ণাবর্তে অনেকেই যে পরে প্রতিভাসিত হয়েছেন নিজেদের পূর্বতন সর্বস্বকে পরিমার্জিত হতে দিয়ে, তার প্রমাণ বুদ্ধদেব প্রমুখ অনেকে ; আর এই আঘাতে কারা প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল হবেন, তা আজকের নয়, কালকের কথা। তবু আমরা—গত দু-তিন দশকের অধিবাসীরাই জীবনানন্দের সৎ এবং একান্ত পাঠক, তাই আরো

অনেকদিন আমাদের জীবনানন্দের হৈমন্তী ধূসর দূর ইতিহাসবলুপ্ত পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের জগতে আসা যাওয়া করতে হবে, যেটুকু প্রতিকূলতার সন্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা, তা মেনে নিয়েও; তাঁর মৃত্যুর পরে আপাতত এই কথাই সব চাইতে বড়ো করে ভাববার।

'লিটল ম্যাগাজিন 'ময়ূখ' পত্রিকার যেমন জীবনের শেষদিকে নিয়মিত লেখক ছিলেন জীবনানন্দ, তেম্নি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী'তেও তাঁর গদ্য-পদ্য নিয়মিত বের হ'তো। 'মাসিক বসুমতী'তে কবির মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সেকালে কবির উদ্দেশে কয়েকটি শ্রদ্ধানিবেদিত কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিলো: ১. জীবনানন্দ দাশ স্মরণে: ইন্দ্রজিৎ (আশ্বিন ১৩৬১); ২. জীবনানন্দ দাশ স্মরণে: পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় (আশ্বিন ১৩৬১); ৩. জীবনানন্দের নামে: কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (কার্তিক ১৩৬১)।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে ক্রমশ তাঁর কাব্যবিষয়ক আলোচনা-সমালোচনার ধারা স্ফারিত ও স্ফীত হ'তে থাকে। 'প্রগতিশীল' 'পরিচয়' পত্রিকায় কার্তিক ১৩৬১ সংখ্যায় 'বিয়োগপঞ্জী'তে জীবনানন্দের কথা লিখে পাপস্খালন করেন ননী ভৌমিক। 'রক্ষণশীল' 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৬১) সংবাদ সাহিত্য বিভাগে ছ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনায় দীর্ঘকাল জীবনানন্দের প্রতি বিরুদ্ধতা করায় দুঃখ প্রকাশ করেন সজনীকান্ত দাস। 'শনিবারের চিঠি'-র বৈশাখ ১৩৬৪ সংখ্যায় কবির "ধূসর পাণ্ডুলিপি" (সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত নতুন সংস্করণ)-র সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়:

> প্রকৃতিঅন্তপ্রাণ জীবনানন্দ দাশের রূপতান্ত্রিক কাব্যভঙ্গির প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে কাব্যরসিক মাত্রেরই এই গ্রন্থটির গভীরে প্রবেশ প্রয়োজন।

মৃত্যুত্তর জীবনানন্দের উপরে নানামুখী আলোচনা-সমালোচনার ধারা প্রবাহিত হয়। সমসাময়িক কবি অজিত দত্ত লেখেন:

> অপরিণত বয়সে কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু হল। সমসাময়িক অধিকাংশ কবির চেয়ে তাঁর বয়স বেশি হয়েছিলো, তবু সতীর্থ হিসেবে জীবনানন্দের মৃত্যুর জন্য ব্যক্তিগত শোক ছাড়াও বাংলা কবিতার পক্ষে জীবনানন্দের মৃত্যু গভীর দুঃখবহ বলে অনুভব করছি। তার কারণ, সমসাময়িক প্রায় সকল কবির চেয়েই তাঁর কবিমন ছিলো অনেক বেশি সক্রিয়। অনেক কবির কলমই যখন প্রায়-নীরব বা অতি-মন্থর, তখনও তাঁর লেখনীতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা যায়নি। কেবল পরিমাণে নয় (অবশ্য খুব বেশি তিনি কোনো দিনই লেখেননি, কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রবাহে বিশেষ কোনো ছেদও পড়েনি), ঐশ্বর্যেও তাঁর কবিতা শেষ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। সব সময়েই তাঁর কাব্যে এমন একটা নতুনত্বের ইঙ্গিত থাকত যে মনে হত তিনি সর্বদাই অগ্রসরমান। সে-কারণে বয়সে অনেকের চেয়ে বড় হলেও তাঁর কাব্যে সম্ভাবনা ছিল অনেকের চেয়েই বেশি। সেই জন্যই বিশেষ করে বাংলা কবিতার দিক থেকে তাঁর মৃত্যু দ্বিগুণ দুঃখের।

"ধূসর পাণ্ডুলিপি"র সমালোচনা প্রসঙ্গে সতেরো বছর আগে একজন সমালোচক দুঃখ করেছিলেন যে, জীবনানন্দের অনুরাগী পাঠকসংখ্যা বড়ই কম। সত্যই কয়েক বছর আগে পর্যন্তও জীবনানন্দের কবিতার সেরকম খ্যাতি বা সমাদর হয়নি। যদিও বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব বহুদিন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে, তবু জীবনানন্দের কবিতা যে দুর্বোধ্য হিজিবিজি কিছু নয়, আস্বাদ করতে পারলে তার

রস যে সত্যই অতুলনীয়, এ ধারণা শিক্ষিত ও কাব্যানুরাগী পাঠকমহলেও বিরল দেখেছি।···

[কবি জীবনানন্দ: অজিত দত্ত,
'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৪]

জীবনানন্দ-আলোচনার আরো অনেক ধারা ছিলো। তার একটি পাওয়া যাবে অনুজ কবি তরুণ সান্ন্যাল-এর তৎকালীন রচনায়। 'সীমান্ত' (সম্পাদক: মণীন্দ্র রায় ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার অংশ:

নির্জনতম কবি বলে কবিতাপাঠক মহলে খ্যাত স্পর্শগন্ধসচেতন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধূসরতার সংবেদন-আত্মা কবি জীবনানন্দ দাশ লোকান্তরিত হয়েছেন। কবিতা পাঠক মহলে তাঁর মৃত্যু গভীর ছাপ রেখে গেছে।···

কবি যদি শুধু ছন্দবিশারদ এবং চিত্রকল্পব্যবহারেই পটু বলে পরিচিত হন তবে তাঁর কবিগুণের মধ্যে যে অনেকটা ফাঁক আছে তা বোঝা অসম্ভব নয়। তাই জীবনানন্দের ছন্দে এবং বিলম্বিতমাত্রা পয়ারে যে নিপুণতা, তাঁর কবিতায় যে অপরূপ চিত্রকল্পের ব্যবহার, শুধু তা দিয়ে তাঁর পরিচিতি স্বীকৃত হলে কবি জীবনানন্দের উপর অবিচার হবে। কবিকে চিনব তাঁর কাব্যে, তাঁর আনন্দ বা বেদনাবোধের গভীরতায় বিশ্বাসের তন্ময়তায় এবং বিশেষভাবে কোনও কবিদর্শনের প্রকাশনায়।···

··· কাব্য শক্তিতে তিনি [জীবনানন্দ] সব্যসাচী। অথচ নগরকে তিনি দেখলেন; দুর্ভিক্ষ, বেয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশের আন্দোলন দেখলেন; কিছুই তাঁর চেতনায় দাগ কাটলো না (একমাত্র দাঙ্গা ছাড়া), শুধু মানুষের লোভের জন্য স্খলনই তিনি দেখলেন। এ স্খলন ব্যাবিলনে যেমন এসেছিল, একমাত্র তারই উপমা যেন। "সাতটি তারার তিমিরে" এমন অস্বাচ্ছন্দ্য আছে যা পাঠককে বিভ্রান্ত করে। মনে হয়, এ বিভ্রম কবিরও। তিনিও বোধহয় দেশের ও পৃথিবীর তাৎপর্য-অনুধাবন করতে চেয়েছেন, কিন্তু অজস্র চেতনা আর চেতনার সংঘাতের ঘূর্ণিতে তিনি বিভ্রান্ত।

··· ১৯৪৬-৪৭ সালের পর জীবনানন্দের অনুভবের উত্তরণ ঘটেছিল। তার প্রমাণ '১৯৪৬-৪৭', 'মানুষের মৃত্যু হলে' প্রভৃতি কবিতায় আছে। তিনিও কী মানুষের সামাজিক জীবনের দুঃখে তখন বিচলিত হয়েছিলেন? ···এ জীবনানন্দ "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র জীবনানন্দের চেয়ে ভিন্ন রূপ। আর এই জন্যেই আমরা তাঁকে স্মরণে রাখবো, জানবো, একজন কবি কীভাবে স্ববিরতা থেকে বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

কিন্তু সচেতন বাস্তব-বিশ্লেষণের অভাবে সবই শেষ পর্যন্ত অস্পষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর শেষ জীবনের কবিতায় দেখা গেলো অতীন্দ্রিয়তার ঝোঁক। কাব্য পাঠক সেখানে স্তব্ধ।

['জীবনানন্দ দাশ': তরুণ সান্ন্যাল, 'সীমান্ত', শ্রাবণ ১৩৬২]

৪.২.

মৃত্যুকালেই জীবনানন্দ-যে কবিস্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর মৃত্যুর পরে-পরে অন্তত সাতটি পত্রিকার বিশেষ জীবনানন্দ-সংখ্যার প্রকাশ। পত্রিকাগুলি এই:

১. 'কবিতা'। পৌষ ১৩৬১, ২৯:২। সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু।
২. 'ময়ূখ'। পৌষ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১-৬২। সম্পাদক: জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী।

৩. 'উষা'। কার্তিক ১৩৬১। এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু।
৪. 'উত্তরসূরী'। পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১, ২:২। সম্পাদক: অরুণ ভট্টাচার্য।
৫. 'জলার্ক'। কার্তিক ১৩৬১, ২:৭। সম্পাদক: সুরজিৎ দাশগুপ্ত।
৬. 'গার্লস কলেজ পত্রিকা', হাওড়া। ১৯৫৪-৫৫। সম্পাদক: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭. 'একক'। যতীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ সংখ্যা। সম্পাদক: শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ-স্মৃতি' সংখ্যার সূচিপত্রটি এই:

জীবনানন্দ দাশ: বুদ্ধদেব বসু
কোবিদ-কবি জীবনানন্দ: সঞ্জয় ভট্টাচার্য
আমাদের কবি: অশোক মিত্র
যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার: অমলেন্দু বসু
জীবনানন্দ দাশের আস্তিকতা: অরুণকুমার সরকার
জীবনানন্দ দাশের কবিতা: নরেশ গুহ
জীবনানন্দের জগৎ: অশোকবিজয় রাহা
পত্রাংশ: অমিয় চক্রবর্তী
কবিতার কথা (অংশ): জীবনানন্দ দাশ
কবিতাগুচ্ছ: জীবনানন্দ দাশ

এছাড়া স্থান পেয়েছে কবির প্রতিকৃতি, পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি, জীবনী-পঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী, প্রকাশিত কবিতার তালিকা, আনন্দ বাগচী ও রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর নিবেদিত কবিতা প্রভৃতি। জীবনানন্দের খুব বেশি ফটো নেই; 'কবিতা' পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর প্রতিকৃতিটি সুন্দর, এটি তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"তেও ছাপা হয়েছে, এবং এটিই কবির সুপরিচিত ছবি। 'কবিতা' পত্রিকা মূল্যবান জীবনানন্দ-আলোচনাগুলি সংগ্রহ তো করেছিলোই, আরো মূল্যবান কাজ করেছিলো কবির গ্রন্থপঞ্জী, জীবনপঞ্জী, প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধের তালিকা, কবির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ইত্যাদির তালিকা প্রথমবারের মতো সংকলন ক'রে। বস্তুত এগুলি জীবনানন্দ-চর্চার প্রাথমিক উৎস হিশাবে কাজ করেছে। কবির শেষ পর্যায়ের আটটি কবিতা এবং সে-বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর নোট— এই পত্রিকার আর-একটি দামি সঞ্চয়। বুদ্ধদেবের এই অপ্রচারিত মন্তব্য থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি, যার মধ্যে পাঠক পাবেন জীবনানন্দের অন্দরমহলের সংবাদ:

> জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন ছাত্রব্যবহার্য পাৎলা এক্সেরসাইজ খাতায়, শক্ত পেন-সিলে। তাঁর অভ্যেস ছিলো দুপুর বেলায় লেখা, এবং রচনাটি মনঃপূতভাবে শেষ হ'লে পরে, রাত্রে অন্য খাতায় কালিতে তার প্রতিলিপি তোলা। প্রতি কবিতায় রচনার তারিখ সাধারণত উল্লেখ করতেন না, কিন্তু খাতার মলাটে মাস, বছরের উল্লেখ থাকতো। কবির অনুজ শ্রী অশোকানন্দ দাশের সৌজন্যে এই রকম দুটি মূল রচনার খাতা আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি: একটির তারিখ নবেম্বর ১৯৫১-জানুয়ারী ১৯৫২, অন্যটি মে-জুন ১৯৫৪। এই দ্বিতীয় খাতার পর আর-কোনো খাতা পাওয়া যায়নি, অতএব ধ'রে নিতে হচ্ছে যে এতেই জীবনানন্দ তাঁর সর্বশেষ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন বা আরম্ভ করেছিলেন।

'ময়ূখ' পত্রিকার জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যার সূচিপত্র এই :

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : জীবনানন্দ দাশ
অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
জীবনানন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ : বাণী রায়
কাছের জীবনানন্দ : সুচরিতা দাশ
মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ : নীহাররঞ্জন রায়
কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে : আবুল কামাল শামসুদ্দীন[১৯]
নির্জনতম কবি : স্নেহাকর ভট্টাচার্য
শেষের ক-দিন : সমর চক্রবর্তী

কবিতা

অপ্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা কবিতা : জীবনানন্দ দাশ
আর্ত : শ্রী মৃণালকান্তি
কবির নামে : অমল দত্ত
উজ্জ্বল মনের পাখি : শিপ্রা মুখোপাধ্যায়
জীবনানন্দ দাশ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ
হাজার বছরের তারা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল
সফেন শিশির : দীপনারায়ণ দত্ত
তোমাকে : অবিনাশ রায়
নিদ্রাদীপ্র : শক্তি দেব

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ : জীবনানন্দকে
জীবনানন্দ : রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যকে

অনুবাদ

জীবনানন্দ দাশ : সুচেতনা : চিদানন্দ দাশগুপ্ত[২০]
জীবনানন্দের প্রকাশিত-ও-অগ্রন্থিত রচনার পঞ্জী
সম্পাদকীয়

'কবিতা' পত্রিকার মতোই 'ময়ূখ' পত্রিকাটিও জীবনানন্দ বিষয়ে মহার্ঘ একটি সংকলন। প্রবন্ধগুলি বাদে মূল্যবান এই পত্রিকায় জীবনানন্দের হস্তলিপি, রবীন্দ্রনাথের লেখা

জীবনানন্দকে চিঠি, এবং জীবনানন্দের চিঠিপত্র, কবির প্রথম জীবনে লেখা ইংরেজি কবিতার নমুনা, কবির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতার সুদীর্ঘ একটি তালিকা—ইত্যাদি। 'ময়ূখ' পত্রিকার দীর্ঘ সম্পাদকীয় থেকে সমকালীন আবহটি অনুমান ক'রে নেওয়া যায়—এখানে আংশিক উৎকলন করা হ'লো :

> ···জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে অল্প কয়েকখানি স্মৃতি-সংখ্যা বেরিয়েছে, ভালো করেই বেরিয়েছে, তার পরেও, অনেকের মনে হতে পারে, এখানার দরকার ছিলো। ছিলো এই জন্যে যে, বাংলার তরুণতর কবিগোষ্ঠীর হাতে কাগজ যেহেতু একাধিক রয়েছে আধুনিক কাব্যধারার প্রধানতম এবং সম্ভবত মহত্তম কবি-প্রতিভার অবসানে তাই, তাঁদের উপর ঘটনাটার প্রতিক্রিয়া কতোটা গভীর হয়েছে, তার একটা বাহ্য অভি-ব্যক্তিও লোকে দেখতে চাইতে পারে বলে, একাধিক তরুণতর কবিতা সংকলন বা কবিতাপত্রের, পাঁচমিশেলি সাহিত্যপত্রগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, ব্যবহারে সাধারণ পাঠক হতচকিত হতে পারে, তাঁদের সংসার-নিরপেক্ষ পরম-ঈশ্বরবোধান্বেষী নির্বিকারতা দেখে, এই ব্যাপারে। একখানি অন্তত তরুণদের কবিতাপত্রিকা অনেকের চাইতেই বেশি আন্তরিক হলেও, কেউ-কেউ এক পাতা বা আট-দশ পঙক্তি সম্পাদকীয়ে যথাকর্তব্য সমাধান করেছেন বলে, মনে হয়, এতো দেরিতে বেরুলেও এই স্মৃতি-সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা, অন্যসব যুক্তিতর্কের কথা মূল্যহীন মনে করলেও তরুণতর কাব্য প্রচেষ্টদের স্বার্থেই অনেক মূল্যবান, কেননা, শাদা বাংলায় বললে, সাধারণ পাঠকমহল স্মৃতিসংখ্যা না হ'লেও, নয়ই বা কেন, স্মৃতিসংখ্যাই আরো কয়েকখানি অন্তত আশা করেছিলো। এইসব ব্যাপারে স্মৃতিসংখ্যাটির একযোগিতা বিলম্বহেতু কিঞ্চিৎ অসাময়িক হলেও কমে যায়নি। আধুনিক কবিতা সর্বব্যাপক হলেও এখনো তার স্থবির বিপক্ষ দল কুটিলতা নিয়ে হিংস্র হয়ে নেই, এমন নয়; এদের পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যাবাহুল্য দেখলেই তা বোঝা যাবে ; আর মাঝামাঝি যেসব পত্রিকা চলছে বাজারে, আধুনিক সাহিত্যের বলে লোকে যাদের ভুল বুঝে থাকে, তারাও আধুনিক নয় পুরোপুরি, দুদলের পাঠকই হাতে রাখার জন্যে দুধারার সাহিত্যের এক কিম্ভূত রসায়ন হতে গিয়ে পঞ্জিকার মতো বৃহদাকারে অসাধু ; —এই পটভূমিকায় নিছক আধুনিক সাহিত্যেরই পত্রিকা যে অল্প কয়েকখানা, বিশেষ করে তরুণদের পরিচালিত পত্রিকা, তাদের যে আধুনিক সাহিত্যধারার যে-কোনো প্রধান ঘটনা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়, এ-কথা বলা বাহুল্য। জীবনানন্দের মৃত্যু নিশ্চয়ই একটা অসাধারণ দুঃখবহ ঘটনা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে নমো নমো করে দায় সারা হলো, একটা বিস্তীর্ণ শোকসভা পর্যন্ত হলো না, হলো না এমন দেশে যেখানে কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চিমি কবিকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে, অন্তর্কলকাঠির কোন গূঢ় কার্যকারণে, কে জানে, বাংলা দেশের তরুণতর কোনো-কোনো সাহিত্যসেবী-গোষ্ঠী লজ্জাকর আড়ম্বরের সঙ্গে সভাসমিতির আয়োজন করে থাকেন ; হাজারটা অভিনন্দন-সভা হয়ে থাকে যেখানে কোনো-কোনো অক্ষম উপন্যাস যদি সরকারী পুরস্কার পায় তবে ;—এসব দুঃখিত হওয়ার মতো ঘটনা। আশা করা যাচ্ছে, জীবনানন্দের মৃত্যুতে যে আমাদের সাহিত্য-জগতে বিপর্যস্ত বোধ করার মতো কোনো ব্যাপার ঘটেছে, তা আমরা অচিরে বিস্মৃত হবো, বা স্বীকার করবো না আর, কিন্তু তাঁর কবিতা দ্বারা সজ্ঞানে প্রভাবিত হবার কার্যে নিবিড় হবো ক্রমশ। এই প্রসঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ না-জানিয়ে উপায় নেই আমাদের ; সে যেমন আদিকাল থেকেই আধুনিক কাব্য-ধারার মূল্যবান সহায়করূপে কার্যক্রম প্রবাহিত করেছে, আজও এতো বছর পরেও দেখিয়ে দিয়েছে তেমনি, তরুণতর সপ্রাণতার চাইতেও সে-ই অধিকতর প্রাণবান হয়তো ; স্বয়ং-আরোপিত সম্মানে গম্ভীর নির্বিকার সন্ন্যাসী হওয়া ভাণ মাত্র যেহেতু,

শ্রদ্ধা জানাতে পেরে শ্রদ্ধেয়, তাই, সে ; স্বল্প-সার্থক অনেক পত্রিকার চাইতেই সৎ সার্থকতার অহং-মোহে নির্বিকার নির্বিকল্প হলেও হয়তো তাকেই যা-হোক মানাতো, এসব মুখপত্র-মুখী কাগজগুলোকে যা মানায়নি আদৌ।

*

আরেকটা ব্যাপারে আমাদের একটা গোপন তৃপ্তি আছে, সেকথাটা 'ময়ূখে'র একান্ত বন্ধুদের কাছে জানাতে হয়। "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা" ভারত-রাষ্ট্রের পুরস্কার পেয়েছে, এ খবরটা সর্বজ্ঞাত হলেও অনেকে হয়তো জানেন না যে, এই পুস্তকখানা যাতে পুরস্কৃত না-হয়, তার জন্যে শক্তিশালী সৎ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের অনেক গণ্যমান্য গুরুস্থানীয়েরা করেছিলেন। তাঁর বিপক্ষে জনৈক আধুনিক কবিকেই, শুনেছি, তাঁরা প্রতিযোগী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, যাঁর নাম না-জানানোই বাঞ্ছনীয়। ····তবু যা-হোক, সরকারী শিরোপা মানেই যখন পুরস্কৃত হবার যোগ্যতা প্রমাণিত করে না সাধারণত, তখন অন্তত এই একটা যথাথই ন্যায়নিষ্ঠ কাজের জন্যে সরকারী প্রধানরা ধন্যবাদার্হ হবেন। পাঠক-সাধারণ তৃপ্ত হয়েছেন নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ ১৯৪৭—৫৪ সালের সাহিত্যপুরস্কার পেয়েছেন যেহেতু ; তাঁর মৃত্যুর পরে হলেও তাঁর নামের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের বঙ্গ ভাষায় প্রথম পুরস্কারের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রইলো বলে। তবে "ময়ূখে'র গোপন তৃপ্তিটা এই জন্যে যে, সে স্বাক্ষর-সংকলিত পত্রাদি প্রেরণ করে এই ন্যায়-সাফল্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হয়েছিলো।

"উষা"[২১] পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যার সূচী এই :

কবিতা

জীবনানন্দ : প্রেমেন্দ্র মিত্র
জীবনানন্দ স্মরণে : অরুণকুমার সরকার
জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কোনো খেদ নাই : সুবোধকুমার গুপ্ত
২২শে অক্টোবর : আলোক সরকার
সেই দিন : আনন্দ বাগচী
পাণ্ডুলিপির রং : নিদ্রার আগে : ভূমেন্দ্র গুহ
এবার বিদায় দাও : তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মৃত্তিকারে ভালোবেসে : অনিমেষ সেন
জীবনানন্দ : বটকৃষ্ণ দাস

প্রবন্ধ

জীবনানন্দ দাশ : অশোকানন্দ দাশ
চারটি কবিতা : পিয়ের ফালোঁ এস. জে.
জীবনানন্দ দাশ : নরেশ গুহ
জীবনানন্দ দাশ : চিদানন্দ দাশ

লৌকিক কবি জীবনানন্দ দাশ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

আমার চোখে কবি জীবনানন্দ : সুবোধ রায়

জীবনানন্দ স্মরণে : অমল দত্ত

কবি জীবনানন্দ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কবিত্বের কবি জীবনানন্দ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ, স্মৃতিকথা ও পর্যালোচনায় এই সংখ্যাটি ছিলো মোটামুটি সমৃদ্ধ। অশোকানন্দ দাশ, সুবোধ রায়, অমল দত্তের স্মৃতিকথা উপভোগ্য। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পিয়ের ফালোঁ এস. জে.-র রচনাটি।

রচনাটির সূচনা হয়েছে এভাবে :

> সম্প্রতি দুজন কবির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে বেদনাহত হলাম। ফরাসি কবি পল এলুয়ার এবং বাঙালী কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে জীবনে কোন দিন আলাপ-পরিচয় হয়নি, তবুও তাঁদের পরমাত্মীয় বলে মনে করতাম।

একটি অনুচ্ছেদ :

> 'বনলতা সেন'-এরই কবি ব'লে জীবনানন্দকে বহুদিন মনে মনে আখ্যা দিয়েছিলাম। "মহাপৃথিবী" ও "সাতটি তারার তিমির"-এর অনেক কবিতা পাঠ করেছিলাম, উপভোগও করেছিলাম বটে, কিন্তু কবির মনে ক্রমে যে গভীর পরিবর্তন এসেছিলো সেই 'নির্জন আত্মমুখী ও স্বপ্নাবিষ্ট' মানুষের প্রাণে সমকালীন জগতের অর্থহীন অশান্তি যে মর্মভেদী জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিলো তা আমি বহু দিন লক্ষ্য করতে পারিনি। সেই দিন কিন্তু তাঁর নব প্রকাশিত চারটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত, 'অনেক রাত্রিদিন,' 'তোমাকে ভালবেসে', 'লক্ষ্য' ও 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাগুলির সুর যেন নতুন ব'লে মনে হয়েছিল। কবির মন অতি ক্লান্ত ও বিষণ্ণ, তবুও ব্যাকুল অস্থির। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে কবি আপাতত অর্থহীন জীবনের সত্যকার তাৎপর্য খুঁজে বেড়িয়েছেন।

'উত্তরসূরী' পত্রিকার 'জীবনানন্দ স্মরণে' সংখ্যাটির সূচী :

উপলব্ধি (কবিতা) : জীবনানন্দ দাশ

আমার মা বাবা (স্মৃতিকথা) : জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দের প্রাকৃতিক ও পারিবারিক পরিবেশ : অশোকানন্দ দাশ

একটি চিঠি : জীবনানন্দ দাশ

কবি জীবনানন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জীবনানন্দের কাব্যচেতনা : ত্রিদিব ঘোষ

বনলতা সেন-প্রেম ও ইতিহাসচেতনা : কল্যাণী কার্লেকার

জীবনানন্দের কবিপুরুষ : রথীন্দ্রনাথ রায়

জীবনানন্দের কবিতায় কয়েকটি প্রশ্ন : অরুণ ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ দাশের কবিতা : বটকৃষ্ণ দাস

বিপন্ন বিস্ময়ের ছবি : সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়
স্মৃতিচিত্র : শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়
স্মৃতিচিত্র : মুরারি সাহা

এই সংখ্যায় কবির প্রতিকৃতি অংকন করেছিলেন বিমল রায়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো :

উত্তরসূরীর দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের কিছু পূর্বে বাংলাদেশে ও বাইরে আমরা কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীকে হারিয়ে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলুম তা সহজে পূরণ হবার নয়। কবি জীবনানন্দ দাশ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার ও ফরাসি শিল্পী হেনরী মাতিস অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেছেন।

'কবি স্মরণে' একটি বিজ্ঞাপনধর্মী রচনার অংশ :

উত্তরসূরীর সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নিবেদন এই যে তাঁর তিনটি কবিতার বই, যার সংস্করণ নিঃশেষিত, পুনঃপ্রকাশ ও সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত।

'জলার্ক' জীবনানন্দ-সংখ্যার সূচিপত্র :

তিরোধান (কবিতা) : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
জীবনানন্দের কবিতা : হায় চিল, শিরীষের ডালপালা, সাবলীল[২২]
চিঠিপত্র (১—১০) : জীবনানন্দ দাশ
'জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর
বহন করবে বাণী'-রবীন্দ্রনাথ (গদ্যমন্তব্য)
কবি জীবনানন্দ (জীবন-কথা)

'জলার্ক' পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক সুরজিৎ দাশগুপ্তের গদ্যমন্তব্য আংশিকভাবে উদ্ধৃত করছি :

'জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।
—রবীন্দ্রনাথ

গত ১৫ অক্টোবর, ১৯৫৪-র সংবাদপত্রে শ্রদ্ধেয় কবি জীবনানন্দ দাশ মহাশয়ের ট্রাম দুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হবার সংবাদে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কিন্তু তখন একথা দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, তিনি এতো তাড়াতাড়ি এবং এমন অকালে আমাদের ছেড়ে যাবেন। গত ১৩ অক্টোবর কলকাতা বেতারে তাঁর কবিতা আবৃত্তি শুনি, পর দিনই তাঁর শেষ চিঠিটি পাই। কিন্তু যখন ২২ অক্টোবরের মধ্যরাত্রে তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেলাম তখন বেদনা, শোক বা কোনো-কিছু অনুভব করবার বোধ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে গেল। আমি কিছুতে কল্পনা করতে পাচ্ছিনে যে, তাঁকে আর কখনো দেখবো না।

মূলতঃ 'জলার্ক'-এর তরফ থেকে জীবনানন্দর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর কাছে যখনই গেছি, আমার মনে হয়েছে, তিনি এক সুদূর

জগতের অধিবাসী। হয়তো সব কবিই তাই। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশেষভাবে দূরের মানুষ, স্বল্পভাষী ও আত্মপ্রচারে বিমুখ। কবি, এবং কবি ছাড়া জীবনানন্দ আর—কিছুই ছিলেন না; অন্নদাশংকরের ভাষায়, 'আমাদের শুদ্ধতম কবি'। তাঁর সান্নিধ্যে পেতাম একটি গভীর নিঃসঙ্গতা, সকল পল্লবগ্রাহিতার ঊর্ধ্বে সফেন সমুদ্রের অতলে একটি ধ্যান-নিমগ্ন নীরবতা।···

···তাঁর মানসক্ষুব্ধতার সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিলো আধুনিক কালের কেন্দ্রহীন জীবনের মত্ত প্রমথন।···

···আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের দুর্ভাগ্য হয়েছিল। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যই বলব নতুবা আমার আক্ষেপ কেবল পাঠক হিসেবেই বাজত, তা ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধ'রে আরো তীব্র হয়ে বাজত না। আমার বাড়ির সন্মুখবর্তী দৃশ্যাবলীর আলোকচিত্র দেখে তিনি এখানে আসবার জন্য ব্যাকুলতা চিঠিতে ও মুখে প্রকাশ করেছিলেন। হেমন্তের বিকেলে শিরীষবীথির ছায়া দীর্ঘতর, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝিলের কালো জল আরো কালো হয়ে আসে। বাতাসে শীতের আমেজ! বন্যার ঝাপটা স'য়ে এই মাঠ ঘাস এখনো প্রতীক্ষা ক'রে আছে—কে জানে কার জন্যে প্রতীক্ষা! শেষ চিঠিতে তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা লিখেছিলেন—এখন কী ক'রে দেখা করব!

হেমন্তের কবি ব'লে যার প্রসিদ্ধি, হেমন্তের ছায়াপথ বেয়ে তিনি নক্ষত্রের ফুল কুড়োতে চ'লে গেলেন! তাঁর পশ্চাতে আমাদের জন্য রেখে গেলেন যে-বাণীরূপ তার দ্বারা তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত।

১৯৫৩ শালের মাঝামাঝি সময়ে জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস্ কলেজে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক হিশাবে—মৃত্যুকাল অবধি এখানেই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে 'গার্লস কলেজ পত্রিকা' যে-জীবনানন্দ স্মৃতিসংখ্যাটি প্রকাশ করে, তার সূচী এরকম:

সম্পাদকীয়

আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ: অশোকানন্দ দাশ

জীবনানন্দ স্মরণে: অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

লগ্নভ্রষ্ট (কবিতা): প্রণতি দত্ত

জীবনানন্দকে যেমন দেখেছি: অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী

একটি মুহূর্ত: উমা চট্টোপাধ্যায়

কবি পরিক্রমা (কবিতা): অধ্যাপক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী

মহাপ্রয়াণে কবি জীবনানন্দ দাশ: বকুল মজুমদার

স্মৃতি তর্পণ: অধ্যাপক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি: রীণা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর চিরশিশু কবি (কবিতা): অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

কবি জীবনানন্দ স্মরণে: সবিতা পাল

বর্ণগন্ধের কবি জীবনানন্দ: ———

শেষ দেখা: প্রীতি চট্টোপাধ্যায়

মানুষ জীবনানন্দ: অধ্যাপক বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

কবি জীবনানন্দের মহাপ্রয়াণে : ইরা বসু
অবক্ষয় (কবিতা) : —
স্মৃতি : রেখা দে
জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ : জীবন-নদীর তীরে : অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ
ছাত্রী-সম্পাদিকার দপ্তর : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়
সংকলন
আমরা : সহাধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী

In Memorium—
Banalata Sen (Poem) : Jibanananda Das
translated by Prof. Rabin Bannerjee
Jibanananda Das—The Man I saw : Miss Anjali Lahiri
Jibanananda Das—The Man & the Poet : Prof. Akshoy Kumar Basu Majumdar

পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

এই কলেজে তাঁহার অবস্থান মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস। জীবনের অকস্মাৎ—সমাপ্ত শেষ বৎসরটির সহিত এই বিদ্যায়তনের কত নব নিবিড় সম্বন্ধ! সহসা একদিন কবিকে আবিষ্কার করিলাম আমাদেরই মধ্যে, আমাদের তিনি সহকর্মী। · · ·

··· আমাদের দুর্লভ সৌভাগ্য—আমরা তাঁহার শেষ জীবনের সঙ্গী, বন্ধু, সহযোগী। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা তাঁহাকে বড় কাছে পাইয়াছিলাম। তাঁহার জীবনেতিহাসের কোন-একটি পত্রান্তরালে আমাদের এই সাহচর্য, সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে, এইটুকুই আমাদের পাথেয়। · · ·

ছাত্রী-সম্পাদিকার দপ্তর থেকে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় লেখেন :

· · · কলেজের সেই শোকম্লান গম্ভীর পরিবেশ কোনো দিন ভুলবো না, যেদিন অধ্যাপক জীবনানন্দ বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে আঘাত আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আহূত সভায় জানলাম তাঁর ভয়াবহ মৃত্যুর কথা। তাঁর ব্যক্তিগত সাহচর্য লাভ করেছিলাম অতি অল্প দিন, যদিও তাঁর কবি-খ্যাতি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অশ্রুত ছিলো না, তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করবার সৌভাগ্য যেদিন হলো, সেদিন তাঁকে চিনতে পারিনি কবি ব'লে। স্বপ্রতিষ্ঠিত কবির গর্বোন্নত ভঙ্গিমা তো তাঁর ছিলো না। বাংলা সাহিত্যের স্বপ্নসম্ভব কবি কেমন করে ইংরাজী সাহিত্যের দুরূহ প্রবন্ধের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করবেন এ কৌতূহল সহপাঠিনীদের সকলকেই চঞ্চল করে তুলেছিল। তাঁর কবি পরিচয় লাভ করেছি তাঁর সেই আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে, যখন তিনি আমাদের পাঠ্য তালিকার সবশেষ কঠিন প্রবন্ধটি সহজগম্য করবার আপ্রাণ চেষ্টায় আপনাকে ডুবিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁর কণ্ঠ থেকে আবৃত্তি আমরা শুনেছি; আজও তার গুঞ্জরণ যেন শুনতে পাচ্ছি, 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা।'—আবৃত্তি করবার জন্য আমাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর সেই বিনীত সলাজ

ভঙ্গিমা কোনো দিন কি ভুলবো? কত আশা ছিল, তাঁকে দিয়ে তাঁর নিজের কবিতার ব্যাখ্যা করে নেবো। সে-আশা আর কোনো দিন পূর্ণ হবে না। আকস্মিকভাবে মৃত্যু এলো, সৃষ্টি হলো দুস্তর ব্যবধান।

'একক' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলো যতীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ যুগ্ম সংখ্যা। শুধু জীবনানন্দ-বিষয়ক রচনার সূচি এখানে সংকলিত হ'লো :

কবিতা

জীবনানন্দ কবি : নরেন্দ্র দেব

কবির মহাপ্রয়াণ : তরুণ সরকার

জীবনানন্দের মহাপৃথিবী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের স্মরণে : জগন্নাথ বিশ্বাস

প্রবন্ধ

যতীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ : হরপ্রসাদ মিত্র

জীবনানন্দ দাশ : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জীবনানন্দের কাব্যে প্রবহমানতা : অরুণ ভট্টাচার্য

আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দের বাস্তবতাবোধ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হরপ্রসাদ মিত্রের 'যতীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ' প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে এভাবে :

> মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনের ব্যবধানে আধুনিক বাংলা কবিতার দুজন খ্যাতনামা স্রষ্টার তিরোভাব ঘটলো। দুর্ভাগ্য একা আসে না, —এই জনশ্রুতিটির সমর্থন পাওয়া গেল আর একবার।

প্রবন্ধটির মধ্যিখানে একটি শাল-তারিখ পাওয়া যায় :

> ঠিক পাঁজিপুঁথির হিসাবে যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন ১৩১৬-১৭ সালে। আর নজরুল এসেছিলেন ১৩২৭-২৮ সালে। জীবনানন্দ এলেন ১৩৩১-এর কাছাকাছি সময়ে। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই "মরীচিকা' ছাপা হয় ১৩৩০ সালে; নজরুলের "অগ্নি-বীণা" প্রকাশিত হয় ১৯২২-এ, অর্থাৎ ১৩২৯ সালে; আর জীবনানন্দের প্রথম বই '"ঝরা পালক" বের হলো ১৩৩৪ সালে।

প্রবন্ধ শেষে হরপ্রসাদ মিত্র যথার্থই দেখিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের পৃথকতা :

> 'বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : শান্ত হতে হবে'—প্রকৃতি তাঁকে শান্ত করেছিল। বাংলা কবিতায় গত বিশ বছরের বিচিত্র আধুনিকতার মধ্যে তিনি বারবার সেই চিরকালের শান্ত মাধুর্যের ছবি এঁকেছেন। /ইদানীং তাঁর কোনো কোনো লেখায় দেখা দিয়েছিল দুর্বোধ্যতা। সে তাঁর গূঢ় মননেরই ভঙ্গি। খ্যাতির শিখরে

পৌঁছেও তিনি শিল্পীর পরীক্ষা পরিত্যাগ করেননি। /যতীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে শান্ত হতে চেয়েছেন। কিন্তু সে তাঁর মর্জির অনুকূল অভিপ্রায় নয়,—স্বভাবের অনুগামী নয়। নিজেকে বলেছেন—'শান্ত হওরে মন! /তুমি নর নহে, তুমি নর নহে, তুমি শুধু নারায়ণ!' ··· যতীন্দ্রনাথের এই শান্তির সঙ্গে জীবনানন্দের সহজ শান্তির সাদৃশ্য নেই। যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী, জীবনানন্দ মুগ্ধ, সমাহিত, বিষণ্ণ।

সব মিলিয়ে 'একক' জীবনানন্দ সংখ্যাটি খুব-একটা উজ্জ্বল সংখ্যা হ'য়ে ওঠেনি বটে, তাহ'লেও অন্তত আলাদা একটি আধারে ধ'রে দিয়েছেন সম্পাদক জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে-পরেই তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

৪.৩.

পঁচিশ বছরের বেশি হ'য়ে গেছে জীবনানন্দের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কবির বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে অনেক আলোচনা-সমালোচনা। জীবনানন্দ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা অবশ্য বেশি নয়; মোটামুটি উল্লেখযোগ্য বই এগুলি:

১. "একটি নক্ষত্র আসে": অম্বুজ বসু। মৌসুমী। ১৯৬৫
২. "কবি জীবনানন্দ দাশ": সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভারবি। ১৯৭০
৩. "জীবনানন্দ": গোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্য সদন। ১৯৭১
৪. "জীবনানন্দ প্রতিভা": রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। আলফা। ১৯৭২
৫. "জীবনানন্দ-স্মৃতি": দেবকুমার বসু-সম্পাদিত। করুণা। ১৯৭১
৬. "জীবনায়ণ": ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত। ১৯৬০
৭. "মানুষ জীবনানন্দ": লাবণ্য দাশ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৭১
৮. "রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ": বিজনকান্তি সরকার। বিজয় সাহিত্যমন্দির। ১৯৭২
৯. *Jibanananda Das*: Chidananda Dasgupta. সাহিত্য একাদেমী। ১৯৭২
১০. "জীবনানন্দ দাশ": বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। অন্বিষ্ট। ১৯৭২

অম্বুজ বসুর "একটি নক্ষত্র আসে" জীবনানন্দ সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ। এ বইএর বহু পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। এ বইএর ভূমিকা লিখেছিলেন অমলেন্দু বসু।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। পর্যালোচনামূলক এ বই; শুধু পরিশিষ্টে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

"জীবনানন্দ স্মৃতি" জীবনানন্দ বিষয়ে অনেকগুলি লেখার সংকলন। সূচিপত্র এ রকম:

জীবনানন্দের বর্ণচেতনা: রবীন্দ্রনাথ সামন্ত; ছন্দকুশলী জীবনানন্দ: নীলরতন সেন; কবিতার ভাষা—জীবনানন্দ: শিশিরকুমার দাশ; সময়গ্রন্থির কবি জীবনানন্দ: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়; আধুনিক কবিতা ও জীবনানন্দ দাশ: নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত; শিশিরের শব্দের কবি জীবনানন্দ: জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়; জীবনানন্দ-কাব্যে

পাশ্চাত্য প্রভাব : সুপ্তি সেন ; জীবনানন্দের বাস্তবতা বোধ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু ; নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যবোধ : ফণী বসু ; প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ : সন্তোষকুমার অধিকারী ; মানব-কবি জীবনানন্দ : বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ; জীবনানন্দের বোধ—একটি দিক : শ্যামল বসু ; জীবনানন্দ দাশ : রঞ্জিত সিংহ ; কবি জীবনানন্দ দাশ : মণীন্দ্র রায় ; জীবনানন্দ দাশের কবিতা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ; জীবনানন্দের কাব্যে সাংগীতিক মূল্য : শৈলেশ ভড় ; জীবনানন্দ দাশের কাব্যে প্রকৃতি : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ; জীবনানন্দ : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ; জীবনানন্দ প্রসঙ্গ : সুশীল রায় ; দিব্য নীলিমার কবি : সুনীলকুমার নন্দী ; জীবনানন্দের চিত্রকল্প : রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ; জীবনানন্দের জগৎ : গৌরাঙ্গ ভৌমিক ; কবি জীবনানন্দ প্রসঙ্গে : কল্যাণকুমার বসু ; যদি উপন্যাস, নায়ক জীবনানন্দ : সত্য গুহ ; জীবনানন্দ—আমার স্বদেশ ও সংকল্প : তুলসী মুখোপাধ্যায় ; আবহমান বাঙালী কবি : অপূর্ব মুখোপাধ্যায় ; আমার দেখা জীবনানন্দ : রমাপতি বসু ; বন্ধু জীবনানন্দ : সুবোধ রায় ; নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ : বাণী রায় ; কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনদর্শন : বিমলচন্দ্র ঘোষ ; জীবনানন্দের কলকাতা : সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ; আমার স্বামী জীবনানন্দ [সাক্ষাৎকার কবিতা সিংহ] ; স্মৃতির পাতায় : লাবণ্য দাশ ; জীবনানন্দ দাশের স্মরণে : বুদ্ধদেব বসু।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "জীবনানন্দ দাশ" গ্রন্থটিও অনেকের রচনার সংকলন। অপেক্ষাকৃত তরুণতর লেখকেরা এতে লিখেছেন। এর সূচী :

সমুদ্র সফেন : প্রভাতকুমার দাস ; জীবনানন্দ দাশের কাব্যাদর্শ : অলোক রায় ; জীবনানন্দ দাশের কবিত্ব কৃতকর্ম ও কবিতা : সুকুমার ঘোষ ; বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ ; জীবনানন্দ ও পশ্চিমী কবির দল : সুধীন মিত্র ; ঝরা পালক—জীবনানন্দ দাশ : বীতশোক ভট্টাচার্য ; সমান্তরাল পৃথিবী—ধূসর পাণ্ডুলিপি : শিবশম্ভু পাল ; বনলতা সেন প্রসঙ্গে : অরুণ ভট্টাচার্য ; মহাপৃথিবীর জীবনানন্দ : মঞ্জুমিতা মিত্র ; সাতটি তারার তিমিরে জীবনানন্দ : বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; রূপসী বাংলার শব্দরূপ : দীননাথ সেন ; জীবনানন্দ দাশ—বেলা অবেলা কালবেলা : অমিতাভ দাশগুপ্ত ; কবি জীবনানন্দ দাশ—গল্পলেখক : বীরেন্দ্র দত্ত ; জীবনানন্দ সম্পর্কিত রচনাপঞ্জী : স্বপন দাসাধিকারী।

"জীবনায়ণ" জীবনানন্দকে নিবেদিত কবিতার সংকলন, রবীন্দ্রশতবর্ষ হেমন্ত ১৩৬৭-তে প্রকাশিত। এই বইএর সূচীপত্র :

জীবনানন্দ দাশ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ; জীবনানন্দ : প্রেমেন্দ্র মিত্র ; জীবনানন্দকে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ; জীবনানন্দ স্মরণে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ; কবির নামে : অমল দত্ত ; জীবনানন্দ দাশ : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ; চিত্র : দিলীপ রায় ; জীবনানন্দ : পূর্ণেন্দু-প্রসাদ ভট্টাচার্য ; পাণ্ডুলিপি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; জীবনানন্দ স্মরণে : অরুণ কুমার সরকার ; জীবনানন্দ : বটকৃষ্ণ দাস ; প্রতীক্ষা : আনন্দ বাগচী ; মহানির্বাণ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ; বাইশে অক্টোবর : আলোক সরকার ; জীবনানন্দ দাশ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ ; হাজার বছরের তারা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল ; একজন মৃত কবির সাহচর্যে—বিকেলে : ভূমেন্দ্র গুহ ; আঁধার উথ্‌লে ওঠে : স্নেহাকর ভট্টাচার্য ; চিত্রলেখা : সুনীল বসু ; আশ্চর্য গভীর স্বর : নচিকেতা ভরদ্বাজ ; জীবনানন্দের নামে : শোভন সোম ; রূপসী বাংলার কবিকে : স্বদেশরঞ্জন দত্ত ; মৃত্যুত্তীর্ণ : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ; অপঘাতের পর : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ; কোন এক কবির মৃত্যুতে : প্রণব মিত্র ; সুচেতনার কবি : অরুণকুমার ভট্টাচার্য ; দেয়ালে

জীবনানন্দের ছবি দেখে : পবিত্র মুখোপাধ্যায় ; কে যেন এখনো ফেরে : পরিমল চক্রবর্তী ; রূপসী বাংলা : সত্যেন্দ্র আচার্য ; চালচিত্র : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ; তোমার প্রতি কর্তব্য : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ; প্রবহমান : অরুণ ভট্টাচার্য ; সনেট : শুদ্ধসত্ত্ব বসু ; আট বছর পরের কোন দিন : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ; আলোকাতীত : গোপাল ভৌমিক।

গোপালচন্দ্র রায়ের "জীবনানন্দ"[২২] জীবনানন্দের প্রথম বিস্তারিত জীবনী। এই বই-এর পরিশিষ্টে কবির অগ্রন্থিত কবিতা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র সংগ্রথিত হয়েছে। "মানুষ জীবনানন্দ" কবির স্ত্রী লাবণ্য দাশ-লিখিত স্মৃতিকথা।

চিদানন্দ দাশগুপ্তের বইটি ইংরেজিতে লেখা। কাল, ব্যক্তি, কবি, অনূদিত কবিতা-গুচ্ছ এবং নির্বাচিত রচনাপঞ্জী---এই পাঁচটি অংশে বইটি বিভক্ত। জীবনানন্দের কবিতার এতো অধিক সংখ্যক ইংরেজি অনুবাদ আর-কেউ করেননি।

জীবনানন্দের কবিতায় বা অন্য রচনায় ভূমিকালেখক বা সম্পাদক হিশাবে অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য :

১. "রূপসী বাংলা"। ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ
২. "ধূসর পাণ্ডুলিপি"। ভূমিকা : অশোকানন্দ দাশ
৩. "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ"। প্রথম খণ্ড। ভূমিকা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৪. "জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ"। দ্বিতীয় খণ্ড। ভূমিকা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৫. "মহাপৃথিবী"। সম্পাদকের নিবেদন : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[২৩]
৬. "মাল্যবান"। ভূমিকা : অমলেন্দু বসু
৭. "জীবনানন্দ দাশের গল্প"। সম্পাদক : সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী। 'ছায়ানট' : প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' : সুনীলকুমার নন্দী। 'বিলাস' : অমলেন্দু বসু। কবির গল্প : লাবণ্য দাশ
৮. "সুদর্শনা"। ভূমিকা : গোপালচন্দ্র রায়

৪.৪.

জীবনানন্দের কবিতা তথা সাহিত্যের একাডেমিক ও সৃষ্টিশীল আলোচনার দুটি ধারা প্রবহমান।

একাডেমিক আলোচকদের মধ্যে গভীর ও বিশিষ্ট শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, রথীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রমুখ। কবির মৃত্যুর পরেই শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, রথীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় তখনই জীবনানন্দকে 'মহত্তম কবি' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ত্রিংশৎ অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণে ড: নীহাররঞ্জন রায় যা বলেছিলেন, তার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> যে-স্বল্পসংখ্যক কবির কবিকর্ম নিয়ে আমার এই গর্ব, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গর্ব, জীবনানন্দ তার অন্যতম, এবং সম্ভবতঃ মহত্তম। জীবনকে আলাদা জগতে নিয়ে নতুন ক'রে সৃষ্টির সাধনার সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তিনি অগ্রচারী। 'আলাদা

> জগৎ' কথাটিতে দূরত্বের ইঙ্গিত আছে, হয়তো-বা অস্পষ্ট ধূসরতার সংকেতও। শুনেও মনে হয়, সে-জগৎ জীবনের কাছাকাছি নয় বুঝি, নির্জন নিঃসঙ্গতায় লালিত সে বুঝি অন্য স্বতন্ত্র এক পৃথিবী। জীবনানন্দের প্রথম দিককার কবিতা প'ড়ে আমার এই ধারণার কথাই মনে হতো। পরে আর তা হয়নি। 'আলাদা জগৎ' বলতে গিয়ে জীবনানন্দ নিজে বলেছেন, 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্প প্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।' এই শুদ্ধতার আবেগেই হয়তো, অতীত আর প্রকৃতির আত্মীয়তায় প্রথম দিকে যতটুকু ব্যক্তিগত ছিলো তাঁর হৃদয়ধর্ম, শেষ পর্যায়ে সেই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ বোধকে অতিক্রম করে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আবহমান ইতিহাসের ব্যাপ্তিতে ও বিশালতায়।

রথীন্দ্রনাথ রায় 'জীবনানন্দের কবিপুরুষ' প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিন্তু উজ্জ্বলভাবে জীবনানন্দের কাব্যজীবনের একটি রেখালেখ্য অংকন করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> জীবনানন্দের কাব্যজীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। তার অর্থ অবশ্য একথা নয় যে এর প্রতিটি পর্ব স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আত্মপর্যাপ্ত। নানা জিজ্ঞাসা ও বক্তব্যের বিন্যাসে জীবনানন্দের কবিচরিত একটি অখণ্ড বোধ—যা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও নব-নব চেতনার আলোকে ক্রমপ্রসারণশীল। এই সংকীর্ণ ও একান্ত খণ্ডিত দৃষ্টি জীবনানন্দের কবি-চরিতের ওপর আলোকপাত না করে বিভ্রান্তি ঘটায়।

তাঁর এই তিনটি গ্রহণযোগ্য ভাগ মোটামুটি এরকম: ১. "ঝরা পালক" পর্যায়ের কবিতা, যেখানে 'নূতন ধরণের চিত্র' এবং 'পয়ার ছন্দের নূতন বিন্যাস' আছে, কিন্তু তবু তা জীবনানন্দের বিশিষ্ট 'জীবন-জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত নয়;' ২. "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যগ্রন্থে 'দ্বিতীয় পর্বের' সূত্রপাত। "ঝরা পালক"-এর গাঢ় বর্ণ এখানে যেন নেই, তার স্থান অধিকার করেছে একটি স্বপ্নাতুর অলস দৃষ্টি ও এক বিশেষ ধরনের প্রকৃতি-চেতনা। তাই চিত্র অপেক্ষাও চিত্রকল্পের ধূসর জগৎ ক্রমশই কবির উপজীব্য হয়ে উঠেছিলো।" ৩. "সাতটি তারার তিমির" আরম্ভ হয়েছে "মহাপৃথিবী"র কবির বিপন্ন বিস্ময় নিয়েই। কিন্তু এই কাব্যেই আর এক মহতী উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় যা জীবনানন্দের কবি-পুরুষের স্বপ্ন-সাফল্যের সীমান্ত।'

সুকুমার সেন ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে জীবনানন্দের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। সুকুমার সেনের আলোচনাটি বিস্তারিত এবং বিস্ময়কর—অন্তর্দর্শনে, অথচ নিরপেক্ষ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে লেখা। রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যাসংগীত"-এর সঙ্গে জীবনানন্দের "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র কোনো-কোনো কবিতার আশ্চর্য সাযুজ্য তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন।

একাডেমিক আলোচনাও কতো সুন্দর ও প্রভাববিস্তারী হ'তে পারে তার উদাহরণ দীপ্তি ত্রিপাঠীর "আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থের 'জীবনানন্দ দাশ' অধ্যায়টি। আলোচনাটি ছ-টি অংশে বিভক্ত (নামকরণ আমাদের)—ধারাবাহিকতা ও পটভূমি, চিত্রলতা, মৃত্যুচেতনা, ইতিহাসচেতনা, সুররিয়ালিজম ও শিল্প প্রকরণ।

৪.৫.

এ-পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি কিন্তু উজ্জ্বল ও উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দ-বিষয়ক কিছু লেখকের রচনার এখানে উল্লেখ করছি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ("সাহিত্য ও সাহিত্যিক"), হরপ্রসাদ মিত্র ("কবিতার বিচিত্র কথা"), অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ("শিল্পিত স্বভাব"), শঙ্খ ঘোষ

("ছন্দের বারান্দা"), বুদ্ধদেব বসু ("An Acre of Green Grass"), লীলা রায় ("A Challenging Decade"), জ্যোতির্ময় দত্ত ('মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ', 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৬৬), হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় ('জীবনানন্দ দাশের মহাপৃথিবী,' 'সারস্বত প্রকাশ', জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫) প্রভৃতি।

৪.৬.

বাংলাদেশে জীবনানন্দ-চর্চা হয়েছে এদেশের অনেক উল্লেখযোগ্য লেখকের হাতে। স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই কয়েকটি :

১. শুদ্ধতম কবি : আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২ ; পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭
২. জীবনানন্দ দাশের কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ। ১৯৭৪
৩. জীবন-শিল্পী জীবনানন্দ দাশ : আসাদুজ্জামান। ১৯৭৬

আলাদাভাবে প্রবন্ধ লিখেছেন অনেকেই : আবুল ফজল ('সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ', 'সমকাল'), সৈয়দ আলী আহসান ("আধুনিক কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে"), আবদুল হাফিজ ('পূর্ব মেঘ'), ড: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (মতিয়র রহমান স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৮০), মরহুম হুমায়ুন কবির ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা' ও অন্যান্য), হাসান হাফিজুর রহমান ('কবিতার বিষয়বস্তু', "আধুনিক কবি ও কবিতা"), শামসুর রাহমান ('একটি মেধাবী গ্রন্থ', 'দৈনিক বাংলা'), মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ ('শুদ্ধতম কবি', "কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা"), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ("দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ"), আহমদ রফিক, হায়াৎ মামুদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মাহমুদ শফিক প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অকাল প্রয়াত তরুণ কবি হুমায়ুন কবির অনেকগুলি আলোচনা লিখেছিলেন।

৫.

পঞ্চাশ বছর হ'য়ে গেলো জীবনানন্দ দাশের আলোচনা-সমালোচনা চলছে। জীবদ্দশায় যা ছিলো ক্ষীণ ও খণ্ডিত এখন তা স্পষ্ট তিনটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে : ১. জীবনানন্দের কবিতা ও অন্যান্য রচনার পর্যালোচনা ; ২. জীবনানন্দের জীবনবিষয়ক তথ্যের সন্ধান ও একত্রীকরণ ; এবং ৩. জীবনানন্দের অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান ও সংকলন, বিভিন্ন লেখন সংগ্রহ ইত্যাদি। এই সব মিলিয়েই দুই বাংলায় চলছে জীবনানন্দ-চর্চা।

তথ্যনির্দেশ

১ 'বর্ষ আবাহন', 'ব্রহ্মবাদী'। জীবনানন্দের সমবয়সী নজরুল ইসলামেরও প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯১৯ শালেই।

২ 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে', 'ব্রহ্মবাদী', ১৩৩২। সাধু ভাষায় রচিত এই নিবন্ধটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকার তিনটি সংখ্যায়।

৩ ১৯৩৬ শালে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের চিঠি : 'প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন ; চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি।'

৪ পরে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" (১৯৩৬) গ্রন্থর্ভূত।

৫ এই সংখ্যা, সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

৬ "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ও "বনলতা সেন"-এর সমালোচনা প্রথমবার 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে "কালের পুতুল" গ্রন্থে পরিমার্জিত আকারে সন্নিবিষ্ট হয়। এখানে এ পরিমার্জিত পাঠই দেওয়া হয়েছে।

৭ এই দুটি রচনাই বর্তমান সংগ্রহে স্থানপ্রাপ্ত।

৮ খুব সম্ভবত স্মৃতিভ্রান্ত হ'য়ে অক্ষয় ভট্টাচার্য "কবি জীবনানন্দ দাশ" গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই রচনার সময় চিহ্নিত করেছেন ১৯৪০ শাল ব'লে।

৯ বর্তমান সংগ্রহের 'নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ' অংশে এই কবিতাটি দেওয়া হয়নি। এই রচনাটি লেখকের প্রকাশিতব্য "জীবনানন্দ-চর্চা" গ্রন্থের ভূমিকা।

১০ "ঝরা পালক" জীবনানন্দ দাশ-স্বাক্ষরেই প্রকাশিত হয়েছিলো। কবি তখন সদ্য গুপ্ত বর্জন করেছেন ব'লে সম্ভবত সমালোচক অতোটা খেয়াল করেননি।

১১ কবিতাটি 'আকাশলীনা' নামে ঈষৎ পরিবর্তিত হ'য়ে কবির "সাতটি তারার তিমির" কবিতাগ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত।

১২ কবিতাটি কবির "মহাপৃথিবী" কবিতাগ্রন্থে আছে।

১৩ কবিতাটি কবির "মহাপৃথিবী" কবিতাগ্রন্থভুক্ত।

১৪ পরে কবির "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থে গৃহীত হয় পরিবর্তিত রূপে।

১৫ পরে কবির "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থভুক্ত।

১৬ জন্ম ১৮৯৯। লাবণ্য দাশের মতে ১৮৯৮ (দ্র. বিষ্ণু দে-সম্পাদিত "একালের কবিতা")।

১৭ গ্রন্থগুলি এই: "ঝরা পালক," "ধূসর পাণ্ডুলিপি," "বনলতা সেন," "মহাপৃথিবী," "সাতটি তারার তিমির," "বনলতা সেন" (পরিবর্ধিত সংস্করণ) এবং "জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা"।

১৮ এই কলেজে চাকরি কাল: ১৯৫৩-৫৪

১৯ ইনি পরে শামসুদ্দীন আবুল কালাম নামে পরিচিত, বরিশাল বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের ছাত্র, বর্তমানে ইতালিতে স্থায়ীভাবে অবস্থিত।

২০ সাহিত্য একাদেমী প্রকাশিত চিদানন্দ দাশগুপ্তের *Jibanananda Das* (১৯৭২) গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত।

২১ 'ঊষা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৬০ (৮:৮) সংখ্যায় 'সমালোচনা সাহিত্য' বিভাগে বরুণ ভৌমিক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "সংবর্ত" ও জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন" (দুটো বই-ই সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত) বই দুটির সপ্রশংস সমালোচনা করেন।

২২ নোট্: 'শেষের দুইটি কবিতা জলার্কতে প্রকাশিত।'

২৩ গোপালচন্দ্র রায়ের "জীবনানন্দ" প্রকাশকালে (১৯৭১) উল্লিখিত ছিলো 'প্রথম খণ্ড' হিশাবে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড এখনো প্রকাশিত হয়নি।

২৪ এই বই এর সম্পাদনা-পদ্ধতি নিয়ে একটি যুক্তিসিদ্ধ আলোচনা লেখেন জ্যোতির্ময় দত্ত, 'কলকাতা' পত্রিকায় (একাদশ-দ্বাদশ সংকলন, ১৩ আগস্ট ১৯৬৯)।